মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০০৪
যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতর

মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২০০৪

ঢাকা, ১লা এপ্রিল -- ওয়াশিংটনে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ণ বিবরণী নিচে দেয়া হলোঃ

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। এখানে ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির (বিএনপি) নেত্রী খালেদা জিয়া ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরে দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের বিবেচিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হন। জামাতে ইসলামী, বালাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি) ও ইসলামী ঐক্য জোট (আইওজে)-কে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি একটি চার দলীয় জোট সরকার গঠন করে। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা জোরালো এবং সহিংসতা রাজনৈতিক প্রচারাভিযানসহ রাজনীতির সর্বত্র বিরাজমান। একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (সিজি) তত্ত্বাবধানে ২০০১ সালের নির্বাচন বিক্ষিপ্ত হানাহানি ও বিচ্ছিন্ন অনিয়মের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তর তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করেছে এবং প্রায়ই সরকারের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে; তবে বিচার বিভাগের নিম্নস্তর নির্বাহী শাখার প্রভাবাধীন। নিম্নতর স্তরের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা সরকারী সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে অনিচ্ছুক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এই সব বাহিনীর মুখ্য দায়িত্ব হলো অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা। তবে কখনো কখনো তাদেরকে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারও দায়িত্ব দেয়া হয়। দুর্ধর্ষ অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার সম্প্রতি সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী ও নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের সমন্বয়ে র‍্যাপিড একশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) নামে একটি নতুন পুলিশ ইউনিট গঠন করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তপক্ষের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। র‍্যাব ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত কাজের জন্যও তাদের কদাচিৎ শাস্তি দেয়া হয়েছে। পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে প্রায়ই অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।

দেশের অর্থনীতি মুলত কৃষিভিত্তিক ও বাজারমুখী। কিন্তু সরকার অধিকাংশ সেবা প্রতিষ্ঠান, অনেক পরিবহন কোম্পানি এবং বৃহৎ নির্মাণ ও বিতরণ প্রতিষ্ঠানের মালিক। গত বছর দেশে জনসংখ্যা ছিলো আনুমানিক ১৪ কোটি। বিগত অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিলো শতকরা ৫.৫ ভাগ। মুদ্রাস্ফীতি যেমন নিচু হারে বেড়েছে তেমনি নিচু হারে বেড়েছে মজুরি ও ভাতা। হরতাল, যা প্রায়শ:ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

ডাকা হয়, তা অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে। মৌসুমী বন্যাও শষ্য ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

সরকারের মানবাধিকার রেকর্ড খারাপ রয়েছে এবং সরকার অসংখ্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলো একাধিক বিচার বিভাগ বহির্ভূত হত্যাকান্ড সংঘটিত করে। পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর), সহায়ক বাহিনী আনসার এবং র‍্যাবে নিযুক্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করেছে। বিরোধী বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলায় পুলিশ প্রায়ই মাত্রাতিরিক্ত, কখনো কখনো প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করেছে। গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ ও র‍্যাব নিয়মিতভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ আর এই অবস্থার কারণে নিরাপত্তা হেফাজতে কিছু কিছু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। পুলিশের দুর্নীতি এখনো বড় ধরনের একটি সমস্যা। প্রায় কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই শাস্তি হয়না। শাস্তি না হওয়ার এই অবস্থা, যা অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন কাজের দায় থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে প্রণীত আইনের ফলে আরো খারাপ হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হত্যাকান্ড অবসানে এক গুরুতর অন্তরায় হয়ে রয়েছে। সহিংসতায় কখনো কখনো মৃত্যুর ঘটনা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি খারাপ উপাদান হিসেবেই রয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, এমনকি একই রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন উপদল সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ চলাকালে প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হতাকান্ড সংগঠিত করা সম্পর্কে সংবাদপত্রের খবর সাধারণ ব্যাপার। বিচার বিভাগে বিপুল সংখ্যক মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। বিচারের পূর্বে দীর্ঘ কাল ধরে আটক রাখা একটি সমস্যা। পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে ঘরবাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং সরকার অবৈধ বস্তি বাসীদের জোর করে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে সকল সাংবাদিকই কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করে থাকে। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, ও অন্যদের প্রয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার সমাবেশের স্বাধীনতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক বিরোধীদের সমাবেশের স্বাধীনতাকে সীমিত করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চলাচলের স্বাধীনতাকেও সীমিত করেছে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে এবং কোন কোন সময় বাধ্যতামূলক শ্রমের জন্য নারী ও শিশু পাচার গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। শিশু নির্যাতন ও শিশু পতিতাবৃত্তিও একটি সমস্যা। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, পঙ্গু ও আদিবাসী মানুষদের সমাজে হেয় দৃষ্টিতে দেখা একটি সমস্যা। সরকার শ্রমিকদের অধিকার, বিশেষ করে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) শ্রমিকদের অধিকার সীমিত করেছে। শিশু শ্রম ও শিশু শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন ব্যাপক এবং এটি একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

অনুচ্ছেদ ১ স্বাধীনতাসহ ব্যক্তিসত্ত্বার অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

ক. স্বেচ্ছাচারিতার সংগে বা বেআইনীভাবে জীবন হরণ থেকে অব্যাহতি

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো অনেকগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিচার বিভাগ বহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটায়। পুলিশ, আধাসামরিক সংগঠন বিডিআর ও র‍্যাব অবাঞ্ছিতভাবে মারাত্মক শক্তি ব্যবহার করেছে।

আলোচ্য বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের হাতে মৃত্যুর ঘটনা বেড়েছে। (অনুচ্ছেদ ১ এর গ অংশ দেখুন) অধিকাংশ অপরাধেরই কোন তদন্ত ও শাস্তি হয় না। অপরাধের কোন শাস্তি হয় না, এই মানসিকতা নির্যাতন এবং হত্যাকান্ড অবসানের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যাকান্ডের দায় থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাদের বিরুদ্ধে মূলত: প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী আলোচ্য বছরে র‍্যাব তাদের চলমান অপরাধ দমন অভিযানে ৭৯ জন মানুষকে হত্যা করে। পুলিশের হাতে ক্রসফায়ারে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে থাকাকালীন অথবা পুলিশের অভিযান চলাকালে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। তবে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় র‍্যাবের সাথে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর ক্রসফায়ারে তারা মারা যায়।

১৫ জুলাই র‍্যাবের একটি দল ৭ মে নিহত আওয়ামী লীগের আইন প্রণেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টার হত্যা মামলার সাক্ষী আওয়ামী লীগ কর্মী সুমন আহমেদ মজুমদারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রেফতার অবস্থায় সুমন পরে হাসপাতালে মারা যায়। মানবাধিকার তদন্তকারীরা নিশ্চিত যে সুমন র‍্যাবের কাস্টডিতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের ফলে মারা যায়। এর পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও সুমন হত্যার জন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি অথচ সুমনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ দায়ের করেছে।

৫ আগস্ট, র‍্যাব সদস্যরা ক্রস ফায়ারে একজন অপরাধী পিচ্চি হান্নানকে হত্যা করে। ২৬ জুন হান্নানাকে গ্রেফতার করা হয় এবং র‍্যাব সদস্য ও হান্নানের সহযোগীদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে দিবালোকে গুলি করে হত্যা করা হলে। তারা বিরুদ্ধে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। হান্নানের মৃত্যুর ব্যাপারে সরকার কোন তদন্ত করেনি।

এই বছরে আদালত ২০০৩ সালে মোবারক হোসেন হত্যার অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটি খারিজ করে দেয় ।

দেশের রাজনীতিতে সহিংসতা সর্বত্র বিরাজমান। এই সহিংসতার কারণে প্রায়ই জীবনহানি ঘটে (অনুচ্ছেদ ১ গ এবং অনুচ্ছেদ ৩ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা এবং প্রায়ই কোন না কোন দলের বিভিন্ন উপদলের সমর্থকরা মিছিল ও বিক্ষোভ চলাকালে নিজেদের মধ্যে এবং পুলিশের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত সহিংসতায় ৫২৬ জনের বেশি লোক নিহত হয় এবং ৬২৩৫ জন আহত হয় (অনুচ্ছেদ ১ গ, ঘ এবং অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)।

৭ মে টঙ্গীতে একটি দলীয় জনসভা থেকে বন্দুকধারীরা আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে হত্যা করে। ১০ জুলাই এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ক্ষমতাসীন বিএনপির যুব সংগঠনের একজন নেতাসহ ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বছর পেরিয়ে গেলেও মামলাটি ঝুলছে।

২১ মে সিলেটে মাজারে বোমা বিস্ফোরণে বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। সরকার এই ব্যাপারে গুরুত্বের সঙ্গে কোন তদন্ত করেনি এবং কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

২১ আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভাষণ দেয়ার সময় কয়েক দফা বিস্ফোরণে আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা আইভি রহমানসহ ২০ জন নিহত ও আরো কয়েকশ জন আহত হয়। ২২ আগস্ট সরকার এই ঘটনার তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং কমিশন সরকারের কাছে তাঁর রিপোর্ট প্রদান করে। যদিও সরকার এই রিপোর্ট প্রকাশ করেনি, তবে সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়, এক সদস্যের তদন্ত কমিশন এই হামলার নেপথ্য নায়ক হিসেবে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত থাকার এবং অভ্যন্তরিণ সহযোগিতায় তা করা হয়েছে বলে ইঙ্গিত দেয়।

১৯৭৫ সালের শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি। ২০ অক্টোবর ঢাকা মেট্রোপলিটন আদালত ১৯৭৫ সালে জেলখানায় আওয়ামী লীগের চারনেতা হত্যা মামলায় পাঁচজন বিএনপি নেতাকে খালাস দেয় এবং তিন সেনা কর্মকর্তা ও অপর নয়জনের যাবজ্জীবন এবং অপর তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়।

উত্তেজিত জনতা কর্তৃক হত্যাকান্ড সংঘটিত করার সংবাদ একটি সাধারণ ব্যাপার। গত ৯ ফেব্রায়ারি খুলনা ও বাগেরহাটে জনতা পিটিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত বামপন্থী হলের চার সদস্যকে হত্যা করে। ১ এপ্রিল বাংলা ভাই নামে এক ব্যক্তি প্রাথমিক ভাবে পুলিশের সহায়তায় উত্তরাঞ্চলীয় জেলা রাজশাহী ও সংলগ্ন অন্যান্য জেলাগুলোতে তাদের অপরাধ বিরোধী অভিযান শুরু করে। প্রায় দু'মাস ধরে এই অভিযান চলে এবং তাদের হাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত বামপন্থী গ্রুপের বেশ কয়েকজন নিহত হয়। পরে সংবাদপত্র ও বিরোধীদলের ব্যাপক সমালোচনার মুখে সরকার বাংলা ভাইকে গ্রেফতারের নির্দেশ নেয়। বছরের শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাইকে গ্রেফতার করা যায়নি এবং সে পলাতক রয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে জনতা তিনজন কথিত ডাকাতকে পুড়িয়ে মারে।

খ. নিখোঁজের ঘটনা

আলোচ্য বছরে নিখোঁজ বা গুম করার ঘটনা একটি সমস্যা হয়ে ছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সমিতি (বিএসইএইচআর)-এর হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে মোট ৩৪৪ জন অপহৃত হয়। অপর একটি মানবাধিকার সংগঠনের মতে এ বছর রাজনৈতিক কারণে ২৮ জনকে অপহরণ করা হয় । অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ২৩ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য বান্দনবান জেলার এ্কটি পর্যটন হোটেলের ম্যানেজার হাসান মাহবুব বাবলুকে অপহরণ করা হয় এবং জানা গেছে তার পরিবারের পক্ষ থেকে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দেয়া হয়। তিন সপ্তাহ পর মাহবুবকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্ত আবার হামলা হবে এই ভয়ে মুক্তিপণ দেয়ার কথা সে স্বীকার করতে অনিচছুক এবং এই ধরণের তথ্যের সত্যতা যাচাই করাও খুব কঠিন । ২০০৩ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রামের বিএনপি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জামালুদ্দীন চৌধুরীর অপহরণের ঘটনাটির এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

গ. নির্যাতন ও অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি

সংবিধানে নির্যাতন ও নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর শাস্তিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাহোক, পুলিশ ও র‍্যাব গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নিয়মিতভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় এবং

অন্যান্যভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। হুমকি দেয়া, পেটানো এবং মাঝে মধ্যে বৈদ্যুতিক শক দেয়ার মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা-এর হিসাব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১,৯৫৯ জন এবং মারা গেছে ৪২ জন (অনুচ্ছেদ ১ক, ঘ এবং অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)। অপর একটি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানায়, এবছর নির্যাতনের ফলে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকার দোষী ব্যক্তিদের কদাচিৎ শাস্তি দিয়ে থাকে এবং এই কারণে পুলিশের মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে।

১৪ মে চট্টগ্রামে পুলিশের একটি দল স্কুল শিক্ষক আবু আহমেদ মাস্টারকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় এবং তার ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। পিতার খোঁজে তার পুত্র থানায় এলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার কাছে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে অন্যথায় তার পিতাকে পিটিয়ে মেরে ফেরার হুমকী দেয়। ঘুষের এই অর্থ প্রদানের পর ১৫ মে সকালে পুলিশ মাস্টারকে ছেড়ে দেয়। জেলা দুর্নীতি দমন অফিস থেকে ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে এবং বছর গড়িয়ে গেলেও এই ব্যাপারে এখনো মামলা হয়নি। ১০ আগস্ট পুলিশ সার্জেন্ট আলতাফ হোসেন মোল্লাহ ওয়ারি পুলিশ ফাঁড়িতে আমিনুল কবির সুমনকে ঝুলিয়ে নির্দয় ভাবে সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রহার করে। বাংলাদেশ ক্রাইম নিউজ এজেন্সির রিপোর্টার সুমন আলতাফের কাছে তার বিরুদ্ধে পাচার ও পতিতাবৃত্তির যে অভিযোগ রয়েছে সে ব্যাপরে তার মতামত জানতে চেয়েছিল। সরকার আলতাফকে গ্রেফতার করে। তবে পরবর্তীতে আর কোন ব্যাবস্থা নেয় হয়নি।

বিএসইএইচআর-এর মতে আলোচ্য বছরে সরকারী হেফাজতের বাইরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্তৃক ধষর্ণের ১১টি ঘটনা ঘটেছে। ১৮ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ জিজ্ঞেসাবাদের জন্য ডলি খাতুনকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং সেখানে ১৪ জন পুলিশ তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। জনতার প্রতিবাদের মুখে সরকার ১৪ পুলিশ সদস্যকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করে এবং তাদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেফতার করে। ২১ ডিসেম্বর ডলি এই পুলিশদের বিরুদ্ধে অপরাধ মামলা দায়ের করে। বছরের শেষ নাগাদ মামলাটির অগ্রগতি হয়নি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত নারী নির্যাতন ও ধষর্ণের অভিযোগের কোন তদন্তই হয়না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার ব্যাবস্থা নিয়েছে। ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে এক কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত তিন পুলিশ সদস্যের ফাঁসি সেপ্টেম্বর মাসে রংপুর কারাগারে কার্যকর করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ করার পর মহিলাদের প্রায়ই নিরাপদ হেফাজতে (কার্যত কারাগারে) আটক রাখা হয়, যেখানে তাদের অত্যন্ত খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কখনো কখনো তাদের সেখানে নির্যাতনের এবং আবার ধর্ষণের শিকার হতে হয় (অনুচ্ছেধ ৫ দ্রষ্টব্য)।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও সংবাদপত্রের খবরে আভাস পাওয়া যায় যে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে মহিলাদের নৈতিকতা বিরোধী কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে। প্রায়ই তা ঘটে থাকে ফতোয়ার মাধ্যমে (অনুচ্ছেদ ২গ দ্রষ্টব্য)। যেসব শাস্তি দেয়া হয় বেত্রাঘাত তার অন্যতম। আলোচ্য বছরে ৩৫টি ফতোয়া দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনায় সাত জনকে বেত্রাঘাত করা হয় এবং অন্যরা দৈহিক শাস্তি থেকে শুরু করে একঘরে করে দেয়ার মতো বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ স্বামী বা প্রতিশোধকামী ব্যক্তিরা কখনো কখনো মহিলাদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে (অনুচ্ছেদ ৫ দ্রষ্টব্য)।

কারাগারের অবস্থা অত্যন্ত করুণ এবং এই কারণে কারাগারে কয়েকটি মৃত্যু ঘটেছে। আলোচ্য বছরে কারা হেফাজতে ১০৩ জনের এবং এছাড়া আরো ২৪০ জনের পুলিশ অথবা অন্যান্য নিরাপত্বা বাহিনীর হেফাজতে অথবা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু ঘটে (অনুচ্ছেদ ১ক দ্রষ্টব্য)। সকল কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দী রয়েছে এবং এগুলোতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে কারাগারগুলোর বন্দীর সংখ্যা ৭৬,১৪৮ জন, যা ধারণ ক্ষমতার চেয়ে প্রায় তিন গুণ। কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতা ২৫,৮২৩। মানবাধিকার সংগঠনগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কারাগারগুলোতে আটকদের মধ্যে ৫২,১৩৭ জন বিচারের অপেক্ষায় আছে এবং ২৩,৫৩৬ জন সাজাপ্রাপ্ত এবং ৩৬ জন কোন অভিযোগ ছাড়াই আটক রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারাকক্ষগুলোতে বন্দীর সংখ্যা এতোই বেশি যে তাদের পালা করে ঘুমাতে হয়।

আইনে কিশোর অপরাধীদের বয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে আটক রাখার বিধান থাকলেও সুযোগ সুবিধার অভাবে এদের অনেককে বয়স্ক বন্দীদের সংগেই কার্যত রাখা হয়। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে হাইকোর্ট অভিযুক্ত কিশোরদের অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে রাখার এবং এদেরকে দ্রুত কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্রে পাঠানোর আদেশ দেয়। বেসরকারী কারা পরিদর্শকদের তালিকায় শিশু অধিকার সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য হাইকোর্ট সরকারের প্রতি আদেশ দেয়।

কারাগারে মহিলাদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়। কিন্তু একই ধরনের করুণ অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় তাদেরও। আইগতভাবে সাজাপ্রাপ্ত মহিলা বন্দীদের নিরাপত্বা হেফাজতে থাকা মহিলাদের একসঙ্গে রাখা নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে এই ধরণের কোন পৃথক সুবিধা নেই। ২০০২ সাল থেকে সরকার নিরাপত্বা হেফাজতে থাকা বন্দীদের যেখানে সুবিধা রয়েছে সেখানে ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র অথবা বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পাঠাতে শুরু করেছে।

সাধারণভাবে সরকার আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটিসহ স্বাধীন মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের করাগার পরিদর্শনের অনুমতি দেয় না। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি স্থানীয়ভাবে প্রতিটি কারাগার প্রতি মাসে পরিদর্শন করে। কিন্তু তাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করা হয় না। জেলা জজও মাঝে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করেন। কিন্তু এই সব পরিদর্শনের তথ্যও প্রকাশ করা হয় না।

ঘ. বলপূর্বক গ্রেফতার, আটকাদেশ বা নির্বাসন

সংবিধানে বলপূর্বক গ্রেফতার ও আটকাদেশ নিষিদ্ধ যদিও কর্তৃপক্ষ অহরহই এই বিধান লংঘন করে থাকে, এমনকি অনিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রেও প্রায়ই এই লঙ্ঘন হয়। অবশ্য সংবিধানে এসব শর্তের বাইরে কয়েকটি সুরক্ষার ব্যবস্থাসহ নিবর্তনমূলক আটকের অনুমতি দেয়া হয়েছে। যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা ওয়ারেন্ট ছাড়া কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ ভাজন হিসেব আটক করা যাবে না। সরকার স্বেচ্ছাচারিতার সংগে বিভিন্ন ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আটক করে এবং আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই নাগরিকদের আটকের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন (এসপিএ)-এর মতো জাতীয় নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে।

পুলিশ বাহিনী জাতীয়ভাবে সংগঠিত। সীমান্ত এলাকায় প্রহরা দেয়ার কাজে নিয়োজিত অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে অপরাধ বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে প্রায়ই অনিচ্ছুক থাকে। সরকার প্রায়ই পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কৃতকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি বা ইনডেমনিটি দিয়ে থাকে। পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। সম্পদ, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার অভাব প্রকট। ২০০৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে অপরাধের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যৌথ নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচালিত "অপারেশন ক্লিন হার্ট" চলাকালে তাদের সকল কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে যাতে কোন আইনী ব্যবস্থা না নেয়া যায় সে জন্য একটি আইন পাশ করে। সেই অভিযান চলাকালে আনুমানিক ৫০ জনের মৃত্যু হয় এবং অজানা সংখ্যক মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়। এই অভিযান চলে অক্টোবর, ২০০২ থেকে জানুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত। জয়েন্ট ড্রাইভ ইনডেমনিটি অ্যাক্ট অভিযান চলাকালে মৃত্যু ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আদালতে ন্যায় বিচার চাওয়া থেকে বঞ্চিত করে। ১৩ই এপ্রিল হাইকোর্ট এই ইনডেমনিটি আইনের বৈধতা সম্পর্কে সরকারের ওপর নোটিশ জারি করে। বছরের শেষ নাগাদ এই বিষয়ের কোন অগ্রগতি হয়নি।

সরকার সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্বা বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে অধিকতর সুসজ্জিত র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পুলিশ বাহিনীতে সার্বিক সংস্কারের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু বিরাজমান মানবাধিকার সমস্যা দুরীকরণে সামান্যই সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং মারাত্মকভাবে মানবাধিকার লংঘনে নিয়োজিত রয়েছে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অপরাদের তদন্তের জন্য স্বাধীন কোন সংস্থা না থাকায় সাধারণত পুলিশের নির্যাতের শিকার হয়ে কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চায়না।

ফৌজদারি দন্ডবিধির (১৮৯৮) ৫৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ অধ্যাদেশের (১৯৭৬) ৮৬ ধারার আওতায় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অপরাধমূলক তৎপরতার সন্দেহে আটক করা যেতে পারে। প্রথমে ৫৪ ধারা ও ৮৬ ধারায় কিছু লোককে আটক করার পর কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয় এবং অন্যদের কোন অভিযোগ দায়ের ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। আলোচ্য বছরে এই দু'টি অধ্যাদেশেরই অপব্যবহার করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গণ গ্রেফতার অব্যাহত থাকে । মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি স্থানীয় এনজিও অধিকার জানায় যে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত মোট ৪,১২৬ জনকে ৫৪ ধারায় এবং আরো ৫৮,৭২২ জনকে ৮৬ ধারায় ও ১০০ জনকে ডিএমপি অধ্যাদেশে আটক করা হয়।

সরকার তার রাজনৈতিক বিরোধীদের ও তাদের পরিবারকে হয়রানী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রায়ই ৫৪ ও ৮৬ ধারা প্রয়োগ করে থাকে। পুলিশ কখনো কখনো কোন বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের আগে কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিরোধী কর্মীদের আটক করে এবং ঐ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে। ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার পুলিশ বিরোধীদলের ৩ অক্টোবর ঘোষিত সমাবেশের আগে বিপুল সংখ্যক বিরোধীদলের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। মানবাধিকার এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে হাইকোর্টে দায়েরকৃত এক আবেদনের প্রেক্ষিতে হাই কোর্ট ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ৮৬ ধারায় নাগরিকদের গ্রেফতার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। কিন্ত পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার অব্যাহত রাখে। সংবিধান তাৎক্ষনিকভাবে বিচার পাওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় যা বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়। উদাহরণ হিসবে বলা যায়, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লুএলএ) শ্যামা নিশাত নামের একটি ১৪ বছরের মেয়ের মুক্তির জন্য

আদালতে আবেদন করে। তার বিরুদ্ধে কোন মামলা ছাড়াই মেয়েটি কারাগারে আটক ছিল। আদালত আবেদন মঞ্জুর করে এবং মেয়েটিকে বিএনডব্লুএলএ'র হেফাজতে দেয়ার নির্দেশ দেয়।

২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৪ বছরের একটি বালককে আড়াই বছর কারাগারের হেফাজতে রাখার পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়। অপরাধ দমন অভিযানের সময় তাকে আটক করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে কখনো কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে সরকার বা কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে "দেশের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে" ৩০ দিন পর্যন্ত আটকের আদেশ দিতে পারেন। আটকের ১৫ দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটকে আটক ব্যক্তিকে তার আটকের কারণ জানাতে হবে । বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকের চার মাস পরে একটি উপদেষ্টা বোর্ড মামলাটি পরীক্ষা করার কথা রয়েছে। আটক ব্যক্তির আটকের বিরুদ্ধে আপীল করার অধিকার রয়েছে।

নিয়মিত আদালতে জামিন নেয়ার পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে; যদিও সুনির্দিষ্ট নিরাপত্বা ও আপরাধ আইনে জামিন অযোগ্য সময় পর্যন্ত আটকাদেশ দেয়ার বিধানও রয়েছে । ৩ আগস্ট একটি হাইকোর্ট প্যানেল ৩৬০ দিনের বেশী বিচার চলার কারণে আটক ৭,৪০০ বন্দীকে জামিনে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়।

আটককৃত অপরাধীদের আইজীবী রাখার অধিকার স্বীকৃত। তবে উপদেষ্টা বোর্ডে কোন আইনজীবী কোন আটক ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনা। বিরল ক্ষেত্রে সরকারি উকিল নিয়োগ করা হয় । এখানে কিছু আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সহায়তাও দেয়া হয়। সাধারণভাবে মামলা দায়েরের পরই কেবল উকিল নিয়োগ করতে দেয়া হয়। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে হাইকোর্টের জারি করা এক আদেশে ৫৪ ধারায় আটককৃতদের উকিল নিয়োগের সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বছরে জোর পূর্বক গ্রেফতার চরম আকার ধারণ করে। সরকার অনেক সময় রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ঠেকাতে আটকৃতদের মুক্তির আদেশ নিয়ে পুণরায় ধারাবাহিকভাবে তাদের আটক করে । ২২ মে সরকার বেসরকারি সংস্থা প্রশিকার সভাপতি কাজী ফারুককে প্রতারণা ও দুর্নীতির অভিযোগে আটক করে (সেকশন ৪ দ্র)।

আলোচ্য বছরে সরকার আদালতে বিনা বিচারে ১১ বছর ধরে কারগারে আটক ১৬ জনসহ বিনা বিচারে কারাগারে আটকদের একটি তালিকা পেশ করে। এদের মধ্যে ১০ জন ১০ বছরেরও বেশী, ২৯ জন ৯ বছরের বেশী, ৫১ জন আট বছরের বেশী, ১১১ জন ৭ বছরের বেশী ২৩৮ জন ৬ বছরের বেশী, ৫০২ জন ৫ বছরের বেশী, ৯১৭ জন ৪ বছরের বেশী ১,৫৯২ জন ৩ বছরের বেশী এবং ৩,৬৭৩ জন ২ বছরের বেশী সময় ধরে বিনা বিচারে কারাগারে আটক রয়েছে ।

সরকার তার রাজনৈতিক বিরোধীদের ও তাদের পরিবারকে হয়রানী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রায়ই ৫৪ ও ৮৬ ধারা প্রয়োগ করে থাকে। পুলিশ কখনো কখনো কোন বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের আগে কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই বিরোধী কর্মীদের আটক করে এবং ঐ অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আটকে রাখে এমন কি সেই কর্মসুচি শেষ হওয়ার পরও তাদের আটক রাখা হয়। ১৮ এপ্রিল পুলিশ আওয়ামী লীগের সরকার পতনের আন্দোলন দমন করতে ব্যাপক হারে গণ গ্রেফতার করে। আওয়ামী লীগের সরকার পতনের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পুলিশ ১০ হাজারেরও বেশী লোককে গ্রেফতার করে । সংবাদপত্রের খবরে

বলা বলা হয়, আটককৃতদের কোন রকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আদালত তাদের কয়েকদিন করে সাজার আদেশ দেয়। পরে অবশ্য তাদের অধিকাংশই ছাড়া পেয়ে যায়।

অধিকারের প্রেস মনিটরিং রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য বছরে রাজনৈতিক কারণে মোট ৫২৬ জন নিহত, আনুমানিক ৬২৩৫ আহত এবং ২,৯১৮ জন গ্রেফতার হয় (অনুচ্ছেদ ১ক, গ এবং অনুচ্ছেদ ২ক দ্রষ্টব্য)। অধিকারের এই তালিকায় এপ্রিলের গণগ্রেফতারের সংখ্যা অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

রাজনৈতিক করণে আটকের মোট সংখ্যা নিরূপন করা কঠিন। অনেক রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ দায়ের করা হয় আবার অনেক অপরাধী নিজেদের রাজনৈতিক কর্মী বলে দাবী করে। অধিকাংশ আটকাদেশের মেয়াদ স্থায়ী হয় কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত। অধিকাংশ ক্ষেতে বিবাদীরা জামিন পান কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ভুল অভিযোগ খারিজ বা তা থেকে অব্যাহতি পেতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে।

ঙ. সুষ্ঠু বিচারের অস্বীকৃতি

সংবিধানে একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে বলবৎ সংবিধানের একটি "অস্থায়ী" বিধান অনুযায়ী নিব আদালতগুলোকে নির্বাহী শাখার অংশ হিসেবে ও তার প্রভাবাধীনে রাখা হয়। বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তর অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করে এবং ফৌজদারি, দেওয়ানি এবং রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত মামলাগুলো ক্ষেত্রে প্রায়ই সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেয়। যাহোক, আইনী প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে নিবতর স্তরে দুর্নীতি রয়েছে।

আদালত ব্যবস্থার দুটি স্তর। নিবতর আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট। উভয় আদালতেই ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার শুনানী হয়। নিব আদালত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে গঠিত, যারা সরকারের নির্বাহী শাখার অংশ। সেশন ও জেলা জজগণ বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

সুপ্রীম কোর্ট দুটি ভাগে বিভক্ত: হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট কোর্ট। হাইকোর্টে মুল মামলাগুলোর শুনানী হয় এবং নিবতর আদালতের মামলাগুলোর পর্যালোচনা করা হয়। হাইকোর্টের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি, আদেশ বা সাজার বিরুদ্ধে আপিলের শুনানী গ্রহণের এক্তিয়ার অ্যাপিলেট কোর্টের এবং তার রুলিং অন্য সব আদালতের জন্য বাধ্যতামুলক।

বিচার বিভাগকে নির্বাহী শাখা পৃথক করার জন্য হাইকোর্ট ১৯৯৭ সালে যে আদেশ দেয় সরকার তা বাসতবায়ন না করায় ১৭ আগস্ট সুপ্রীম কোর্ট সরকারের সমালোচনা করে। বছর বিদায় নিলেও সরকার এই আদেশের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেনি।

আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনজীবীর মাধ্যমে তার প্রতিনিধিত্ব করার, অভিযোগের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করার এবং সাক্ষী ডাকার এবং সাজার বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্যে। রাষ্ট্রীয় অর্থে বিবাদীর পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয় কদাচিৎ। আর্থিক সহায়তা দেয়ার কিছু আইনী সহাযতা কার্যক্রম রয়েছে। পিএসএ, এসটিএ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের

আওতায় বিশেষ ট্রাইবুনালে সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর শুনানী হয় এবং রায় দেয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সব মামলার তদন্ত ও বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হবে, যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন না হলে মামলা কিভাবে নিষ্পত্তি করা হবে, তা আইনে স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

আদালতের একটি বড় সমস্যা হলো দুর্নীতি ও অনিষ্পত্তি অবস্থায় ঝুলে থাকা বিপুল সংখ্যক মামলা। মামলাগুলোর বিচার কার্যে দীর্ঘ মুলতবী ঘটে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাগারে আটক থাকে। এই অবস্থা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির কারণে অনেক ব্যক্তি সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের এক জরিপ থেকে দেখা যায়, এসটিএর আওতায় দায়ের করা শতকরা ৬৭ ভাগেরও বেশী মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল এবং আদালতের কর্মকর্তারা ঘুষ দাবি করে (অনুচ্ছেদ ১ঘ দ্রষ্টব্য)। ২০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি একটি অপরাধ মামলার জামিনর জন্য অবৈধভাবে অর্থ গ্রহনের দায়ে হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ শাহীদুর রহমানকে বরখাস্ত করে।

সরকার জানায় যে তাদের কাছে কোন রাজনৈতিক বন্দী নেই। কিন্তু বিরোধী দলগুলো এবং মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা দাবী করেন যে অনেক রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য অপরাধমুলক কাজের অভিযোগে সাজা দেয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১ঘ দ্রষ্টব্য)। এনজিওগুলোরও বন্দীদের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ নেই।

চ. গোপনীয়তা, পরিবার, ঘর বা চিঠিপত্র আদানপ্রদানের ব্যাপারে স্বেচ্ছামুলক হস্তক্ষেপ

আইনে বিধান রয়েছে যে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই বিনা ওয়ারেন্টে তল্লাশি চালানো যাবে না । পুলিশকে কোন বাড়িতে প্রবেশের আগে বিচার বিভাগীয় ওয়ারেন্ট গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ কদাচিৎ ওয়ারেন্ট গ্রহণ করে এবং এই বিধান লঙ্ঘনকারী অফিসারদের শাস্তি দেয়া হয় না। রিপোটার্স উইদাউট বর্ডারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে পুলিশ সাংবাদিকদের ইমেইল মনিটর করে। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটিলিজেন্স এবং ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই) সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী বলে অনুমিত লোকদের সম্পর্কে খবর দেয়া এবং তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার উদ্দেশ্যে চর নিয়োগ করে।

সরকার বিভিন্ন সময় লোকজনকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যত্র পুনর্বাসিত করে। ২০০২ সালের মার্চে হাইকোর্ট ঢাকার আমতলীতে বস্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আবাসন ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আদেশ তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখে এবং বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে কেন আদেশ দেয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়।

অনেক সময় পুলিশ পুলিশের কাছে ওয়ানটেড ব্যক্তিদের ধরার জন্য তার পরিবারের সদস্যদের নানা ধরণের হুমকী দেয়। আলোচ্য বছরে ওয়াটেড ব্যাক্তি সম্পর্কে তথ্য বের করতে তার পরিবারের সদস্যদের উপর আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যদের শারিরীক নির্যাতনের দৃস্টান্ত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ২

নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

ক. বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

সংবিধানে নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সংগে বন্ধুত্ব, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে অথবা চরিত্র হনন বা কোন অপরাধ সংঘটনে উৎসাহ দান প্রতিরোধে "যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যাহোক বাস্তবে সরকার এইসব অধিকার বাস্তবে সীমিত করেছে।

প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় ব্যতীত একজন নাগরিক প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করতে পারে না। রাজনৈতিক সমাবেশ করতে বাধা দিয়ে অথবা তা পন্ড করে দিয়ে সরকার তার বিরুদ্ধে সমালোচনা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে।

শত শত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সরকারের নীতি ও কর্মকান্ডের সমালোচনা করে। সরকারী মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থা ছাড়াওএকটি প্রধান আন্তর্জাতিক কোম্পানির সংগে যুক্ত বেসরকারী মালিকানাধীন একটি সংবাদ সংস্থাও রয়েছে।

সংবাদপত্রের মালিকানা ও বিষয়বস্তু সরাসরি সরকারী বিধিনিষেধের আওতাধীন নয়। কিন্তু সরকার সরকারী বিজ্ঞাপন ও অনুকূল শুল্কে আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্ট সরবরাহের মতো আর্থিক পন্থা ব্যবহার করে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করেছে। অতীতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে অনিচ্ছুক ছিল। অধিকাংশ রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র সরকারি মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত, এদের অধিকাংশ কেন্দ্রের সম্প্রচারের বড় অংশ জুড়ে থাকে সরকারি প্রচারনা। সরকারি মালিকানাধীন গণমাধ্যমে বিরোধী দল খুব সামান্যই কাভারেজ পায়।

তথ্য মন্ত্রনালয় একটি বেসরকারি রেডিও স্টেশনসহ তিনটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমতি দিয়েছে। কেবল অপারেটরা সাধারণ ভাবে সরকারি প্রভাব ছাড়াই কাজ করে ; তবে সকল বেসরকারি স্টেশনকে বিনা খরচে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসহ কিছু সরকারি কার্যক্রম প্রচারকরার শর্ত রয়েছে।

কমিটি ফর প্রটেক্ট জার্নালিস্ট এবং রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) আলোচ্য বছরে দেশের সাংবাদিকদের রক্ষার ও তাদের প্রতি আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছে । সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর হামলা, আধাসামরিক লোকজন অথবা রাজনৈতিক দলসমুহ সার্বক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জীবনকে বিপদাপন্ন করছে। সরকার, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং অন্যদের দ্বারা তাদের প্রতি হুমকী প্রদর্শন অব্যাহত ছিল।

রাজনৈতিক দলগুলো এবং তাদের পক্ষের লোকেরা সংবাদ পরিবেশনার কারণে সংবাদ অফিস ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায়। রাজপথে রাজনৈতিক সহিংসতার সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি সাধারণ ব্যাপার এবং পুলিশী হামলায় কয়েক জন সাংবাদিক আহত হয়।

অধিকারের মতে আলোচ্য বছরে ১১১ জন সাংবাদিক আহত, ৫ জন নিহত , ৯ জন গ্রেফতার, ২ জন অপহরণ, ৩২ জনকে হামলা এবং ২৯৩ জনকে হুমকি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৬টি সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালানো হয়। এর বাইরে সরকারের সমালোচনা করে রিপোর্ট বা নিবন্ধ লেখারে কারণে অনেক সাংবাদিক ও সিনিয়র রিপোর্টারকে টেলিফোনে হুমকী দেয়া হয়। তবে এসব হুমকীর পরবর্তীতে হামলার ঘটনা খুবই বিরল।

১৫ জানুয়ারি দুস্কৃতকারীরা খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও নিউ এজ পত্রিকার এবং সংবাদ পত্রিকার সাংবাদিক মানিক সাহাকে লক্ষ্য করে বোমা মেরে তাকে হত্যা করে। মার্চ মাসে পুলিশ মানিক সাহা হত্যার অভিযোগে বামপন্থী একটি গ্রুপের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ২৭ জুন এক বিস্ফোরণে দৈনিক জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক নিহত হয়; পুলিশ এক্ষেত্রেও বামপন্থীদের দায়ী করেছে। বছর গত হলেও উভয় মামলাই নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

৩ অক্টোবর দৈনিক দুর্জয় বাংলা পত্রিকার নির্বাহি সম্পাদক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের সহসভাপতি দীপংকর চক্রবর্তী কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হয়ে প্রাণ হারান। এই মামলায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু তারা আবার জামিনে ছাড়া পায়। বছর গত হলেও এই মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকার পরোক্ষভাবে সাংবাদিকদের ওপর স্বআরোপিত সেন্সরশীপ প্রয়োগ করার ব্যাপারে চাপ দিয়ে থাকে । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১ জুলাই প্রধান মন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের একজন কর্মকর্তা একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের রিপোর্টারকে ডেকে পাঠান এবং তিনি যদি বিরোধী দলের প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার কাভারেজ বন্ধ না করেন তবে তাকে সরকারি দলের অনুষ্ঠানগুলোতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়ার হুমকী দেন। কথামত চলতে ব্যর্থ হওয়ার দরুন তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের দিন তাকে প্রত্যাহার করে নেয়।

বিদেশী প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র পর্যালোচনা ও সেন্সরশীপের আওতাধীন ছিলো। সরকারের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড স্থানীয় ও বিদেশী ছায়াছবি পর্যালোচনা করে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশালীনতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, চরিত্র হনন বা নকলের অভিযোগে যে কোন ছায়াছবি সেন্সর বা নিষিদ্ধ করতে পারে। ভিডিও লাইব্রেরীগুলো বিভিন্ন ধরনের ফিল্ম তাদের সদস্যদের ভাড়া দিয়ে থাকে আর এদের ক্ষেত্রে সরকারী সেন্সর আরোপের চেষ্টা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে তবে তা ফলপ্রসূ হয় না।

অশালীন আলোকচিত্র, ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা বা অবমাননাকর কোন কিছু লেখা থাকলে অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কোন আপত্তিকর মন্তব্য থাকলে প্রায়শই তাতে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়। ১৫ এপ্রিল সরকার ভারতীয় দেশ পত্রিকার ২ এপ্রিল সংখ্যায় আদম ও হাওয়া সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করায় দেশের এই সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করে।

লেখিকা তসলিমা নাসরিন জামিনে মুক্তি লাভের পর বিদেশেই অবস্থান করছেন। দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ এখনও মুলতুবী রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১গ দ্রষ্টব্য) । ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে একটি আদালত নাসরিনের অনুপস্থিতিতেই “ইসলাম

সম্পর্কে অবমাননাকর" বক্তব্যের জন্য তাকে এক বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। একজন স্থানীয় জামাত-ই-ইসলামী নেতা ১৯৯৯ সালে নাসরিনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন।

সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরাসরি কোন রকম বাধা সৃষ্টি করে না। তবে রিপোটার্স উইদাউট বর্ডারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে পুলিশ সাংবাদিকদের ইমেইল মনিটর করে(অনুচ্ছেদ ১চ দ্রষ্টব্য)।

সরকার শিক্ষাঙ্গানের স্বাধীনতাকে সীমিত করেনি। তবে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণা নিরুৎসাহিত করা হয়।

খ. শান্তিপুর্ণ সভা সমাবেশ করা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা

সংবিধানে জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সভা সমাবেশ করার স্বাধীনতা রয়েছে। অবশ্য, সরকার প্রায়ই এই অধিকার সীমিত করে। ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ধারার আওতায় সরকার চার জনের অধিক ব্যক্তির একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ করতে পারে। একটি মানবাধিকার সংগঠনের ভাষ্য অনুযায়ী আলোচ্য বছরে সরকার ৫৭ বার এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সরকার কখনো কখনো নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ করে। ৩ জানুয়ারি টাঙ্গাইলের মধুপুরের জঙ্গালে বনের জমিনে ইকো পার্ক করার প্রতিবাদে একটি মিছিলে অংশ গ্রহনের সময় পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডদের গুলিতে গারো সম্প্রদায়ের সদস্য পিরেন সণ্যাল নিহত হন। পিরেনের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই ঘটনার ব্যাপারে ম্যাজিস্টেটের আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে। কিন্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারণে ১৭ নভেম্বর মামলাটি খারিজ করে দেয়া হয়। ম্যাজিস্টেটের আদালতের তদন্ত রিপোর্টে অনিয়মের প্রতিবাদে পিরেনের পরিবারের পক্ষ থেকে আরেকটি পিটিশন দয়ের করা হয়। কিন্তু বছর শেষ হলেও বিষয়টি নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

১১ মার্চ ঢাকার মহাখালির কাছে পুলিশের সহায়তায় বিএনপি কর্মীরা সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও তার সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় এবং তিন শতাধিক লোককে আহত করে। বদরুদ্দোজা চৌধুরীরর নতুন দল গঠন উপলক্ষে তারা এই মিছিল নিয়ে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের দিকে আসার সময় এই হামলা চালানো হয়।

কিন্তু অনেক স্বাধীন পর্যবেক্ষক এই সব ব্যাখ্যাকে অজুহাত বলে মনে করেন। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা প্রায়ই একই স্থানে এবং একই সময়ে তাদের সভার আয়োজন করে থাকে যেখানে বিরোধী দলের সভার সময় আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। এর ফলে সরকার সরকার নিরাপত্তার কারণে নিষেধাজ্ঞা জারির একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

আলোচ্য বছর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অনেক বার হরতাল আহ্বান করে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সহিংসতার হুমকি অথবা হরতালভঙ্গাকারীদের প্রতি প্রকৃত সহিংসতার মাধ্যমে এসব হরতাল কার্যকর করে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা হরতালের সময় মিছিল করে। দেশব্যাপি ৬টি পুর্ণ দিবস ও ৫টি অর্ধ দিবস হরতাল ছাড়াও আলোচ্য বছরে স্থানীয় পর্যায়ে অনেকগুলো হরতাল আহবান করা হয়। হরতালের

পুলিশ ক্ষমতাসীন দলের মিছিলে কদাচিৎ বাধা প্রদান করে এবং তারা বিরোধী দলের মিছিল নিরুৎসাহিত করতে এবং সেগুলো পন্ড করতে প্রায়ই ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের সাথে একসাথে কাজ করেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ঢাকায় আওয়ামী লীগের একটি মিছিরে বাধা দেয় এবং দলের সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাষ্টার এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক সচিবসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আহত করে।

সংবিধানে নৈতিকতা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে" প্রতিটি নাগরিকের সমিতি গঠনের অধিকার দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে সরকার এই অধিকার মান্য করে। ব্যক্তি বিশেষ যে কোন বেসরকারী গ্রুপে যোগ দিতে পারে।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। সরকার কার্যত এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যদিও সরকার ধর্মনিরপেক্ষ তবুও রাজনীতিতে ধর্মের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে।

সরকারী ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্যরা বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সরকার তাদেরকে হয়রানি করেছে এরকম কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সরকারী চাকুরী এবং রাজনৈতিক পদলাভের ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কার্যত কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

ধর্মীয় সংগঠনগুলোকে সরকারের কাছে নাম রেজিষ্ট্রি করতে হয় না। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ গ্রহণ করলে সকল এনজিও এবং ধর্মীয় সংগঠনকে সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কাছে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। কোন এনজিও-এর রেজিস্ট্রেশন বাতিল, তার নির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আটক করা অথবা কোন প্রকল্প বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আইনগত ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। এই ক্ষমতা অবশ্যি কদাচিৎ ব্যবহার করা হয় এবং ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন এনজিওগুলো সরকারের এই ক্ষমতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

আলোচ্য বছরেও আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতন অব্যাহত থাকে। জানুয়ারি মাসে সরকার আহম্মদীয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার জন্য কয়েকটি ইসলামী দলের দাবির প্রেক্ষিতে আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ডিসেম্বরে হাইকোর্ট সরকারের এই নির্বাহী আদেশ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। ঢাকা ও পটুয়াখালিতে দু'টি ঘটনায় পুলিশ আহম্মদিয়া সম্প্রদায়ের বই আটক করে এবং জানুয়ারি মাসে খুলনায় আহম্মদিয়া সম্প্রদায়ের লিফলেট বহনের অভিযোগে এক যুবককে সংক্ষিপ্ত কারাদন্ড দেয়া হয়। সময়ে সময়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের চিহ্ন সমুহ উচ্ছেদ করতে দেয় এবং কখনো কখনো তাদের সহযোগিতা করে।

আগের বছরের মতই সরকার এখনও অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করতে সরকার ব্যথ হয় ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় ছেড়ে যাওয়া হিন্দুদের সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহন করে।

সরকার অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা, তাদের যাজকদের প্রশিক্ষণ দান, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, এবং বিদেশে সমধর্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুমতি দেয়। আইনের আওতায় নাগরিকদের ধর্মান্তরকরণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইসলাম থেকে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে জোর সামাজিক বিরোধিতা থাকায় অধিকাংশ খ্রীষ্টান মিশনারিদের লক্ষ্য হচ্ছে কয়েক প্রজন্ম ধরে যারা খ্রীষ্ট ধর্ম পালন করছে তাদের মাঝে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখা। বিদেশী মিশনারিরা দেশে কাজ করতে পারেন, তবে তাদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত নয়। কিছু মিশনারী ভিসা পেতে অথবা ভিসার নবায়ন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় যা অবশ্যই বাৎসরিকভাবে নবায়ন করতে হয়। কিছু বিদেশী মিশনারী উল্লেখ করেছে যে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও অন্যান্য সংস্থা তাদের কাজ খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। তবে কোন মিশনারীই আলোচ্য বছরে অন্য কোন ধরনের হয়রানীর কথা উল্লেখ করেনি।

আলোচ্য বছরে আহম্মদীয়া, হিন্দু ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চলেছে। এপ্রিল মাসে রংপুরের একটি গ্রামে পুলিশ মুসলিম বিক্ষোভকারী হাত থেকে আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের ১২টি বাড়ি রক্ষা করতে এবং ১৫ জন ধর্মান্তরিত আহম্মদীয় সম্প্রদায়ের সমর্থককে নাজেহাল করার হাত থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় মুসলমানরা ধর্মান্তরিতদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কয়েক ঘন্টা আটক রাখে এবং তাদের এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দেয়। আহম্মদীয় সম্প্রদায় খতমে নবুয়ত আন্দোলনের দেয়া হুমকীর হাত থেকে তাদের রক্ষার জন্য সরকারের প্রতি জানায় এবং ২৭ আগষ্ট পুলিশ আহম্মদীয় সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্সে হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে আমরা ঢাকাবাসীর চারজন নেতাকে গ্রেফতার করে ।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যায় ১ জানুয়ারি স্থানীয় বিএনপি নেতার নেতৃত্বে হিন্দুদের ২০ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হলে ৩০ জন আহত হয়। আহতরা জানান জমিজমা নিয়ে বিরোধের জরে হিসেবে এই হামলা চালানো হয় । ২২ সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার আদম শেখের পাড়া গ্রামে একদল মুসলিম হিন্দুদের সাতটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাশাপাশি তারা আগুন নেভাতে আসা লোকজনের উপর হামলা চালায় এবং ১৮ টি গরু চুরি করে নিয়ে গেছে বলে যায়।

১৮ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা জামালপুর জেলার নিজ বাসভবনের সামনে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান ডাঃ জোসেফ গোমেজকে হত্যা করে। পুলিশ এই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকা অভিযেগে স্থানীয় মাদ্রাসা শিক্ষক মওলানা আব্দুস সোবহান মুন্সী ওরফে মিছা মুন্সীকে গ্রেফতার করে দুই সপ্তাহ আটক রাখে কিন্ত পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। বছর শেষ হয়ে গেলেও এই হত্যা জন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি।

সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ ১৮ জনকে গ্রেফতার করে যাদের মধ্যে দু'জন ২০০৩ সালের নভেম্বর চট্টগ্রামে এ্কটি হিন্দু বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে স্বীকরোক্তি করে। এই অগ্নিকান্ডে একটি পরিবারের ১১ জন সদস্য নিহত হয়। ২০০৩ সালে যশোরে একজন আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের নেতাকে হত্যার দায়ে সরকার কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি এবং কাউকে গ্রেফতারের প্রত্যাশাও নেই। ১৪ সেপ্টেম্বর আহম্মদীয় নেতৃবৃন্দ এই হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখান করে আদালতে অনাস্থা পিটিশন দায়ের করে। বছরের শেষে মামলাটি স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) বদলী করা হয়েছে ।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকরা সরকারী চাকুরী ও রাজনৈতিক পদলাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। সরকারী চাকুরীর জন্য নিয়োগ কমিটিতে সাধারণত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের রাখা হয় না।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য ২০০৪ সালের 'আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন' দ্রষ্টব্য।

]

ঘ. দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের, বিদেশ ভ্রমণের, এবং অভিবাসনের ও প্রত্যাবাসনের অধিকার

দেশের অভ্যন্তরে অবাধ চলাচলের অধিকার, বিদেশে ভ্রমণ, অভিবাসন এবং প্রত্যাবাসনের অধিকার সংবিধান প্রদান করেছে। যদিও সরকার এই অধিকার প্রত্যাখান করেছে এমন নজিরও রয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি সরকারি দলের সমর্থকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেনের গাড়ি বহরে হামলা চালায়। একটি উপজাতীয় সংগঠন আয়োজিত সমাবেশে যোগদানের জন্য কামাল হোসেন তখন রাঙামাটি যাচ্ছিলেন। নিরাপত্বার অভাবের কারণে কামাল হোসেন ও তার সফরসঙ্গীরা চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহর বরিশালের চরকাওয়া ফেরিঘাটের কাছে হামলার শিকার হয়।

৬ ফেব্রুয়ারি জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশন কর্মকর্তরা জাতীয় পার্টির সভাপতি ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদকে মালদ্বীপ যাওয়ার পথে বাধা দেয়। এরশাদ জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষে আদেশে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তরা এই কাজ করেছে। সরকার এবং জাতীয় পার্টির নেতাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর এই বিষয়টির মীমাংসা হয় এবং এরশাদকে বিদেশে যেতে দেয়া হয়। মে মাসে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সন্তু লারমাকে আদিবাসী ইস্যু নিয়ে আলোচনার লক্ষে জাতিসংঘ পার্মানেন্ট ফোরামের তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দেয়ার লক্ষে দেশ ত্যাগ করতে দেয়া হয়নি। তিনি তখন

ইসরায়েলে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী পাসপোর্ট বৈধ নয় এবং ২০০৩ সালের নভেম্বর ইসরাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বিমান বন্দর গ্রেফতারকৃত সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরিকে এখনো কারগারে আটক রয়েছেন।

আনুমানিক ৩০০,০০০ বিহারী মুসলিম সারা দেশের বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছে। পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের আশায় তারা ১৯৭১ সাল থেকে এ দেশে রয়েছে। এরা সবাই অবাঙ্গালী মুসলমান, যারা ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতের বিভক্তির পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে অভিবাসী হয়ে আসে। এদের অধিকাংশ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। তারা পরে এ দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং পাকিস্তানে প্রত্যাবাসনের দাবি জানায়। পাকিস্তান সরকার ঐতিহাসিকভাবে বিহারীদের গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসরত বাংলাদেশে জন্মগ্রহনকারী ১০ জন বিহারীকে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। হাইকোর্ট তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক ঘোষণার পর তারা এই অধিকার পায়।

আলোচ্য বছরে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর)-এর সহযোগিতায় সরকার পরিচালিত দু'টি শিবিরে ২০,২৯১ জনের অধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে।

"ইউএনএইচসিআর" সরকারকে এই মর্মে অনুরোধ করে যে, যে সব শরণার্থী ফিরে যেতে পারছে না তাদেরকে এদেশে কাজ করতে দেয়া হোক, তারা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সুবিধা লাভ করুক এবং তাদের সন্তানদেরকে স্থানীয় স্কুলে যেতে দেয়া হোক। সরকার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান অব্যাহত রেখেছে। এই বছরে সরকার মোট ২১০ জন রোহিঙ্গা শরনার্থীকে ফেরত পাঠায়।

নতুন যারা এসেছিল সরকার তাদেরকে প্রথমে আশ্রয় প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদেরকে অবৈধ অর্থনৈতিক অভিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করে। সরকার যথাসম্ভব তাদেরকে সীমান্তে ফিরিয়ে দেয়। "ইউএনএইচসিআর"-এর মতে তারা যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিল, তাদের কিছু সংখ্যক বার্মা সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের ভয়ে পালিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছিল এবং তারা শরণার্থীর মর্যাদা লাভের যোগ্য ছিল। নিবন্ধন করেনি এমন কিছু শরণার্থী, যাদের অনেকেই বার্মাতে সরকারী প্রত্যাবাসনের পর অবৈধভাবে ফেরত এসেছিল, তারা শিবিরগুলোতে বাস করছে এবং তাদের সেই সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে খাবার ভাগ করে নিচ্ছে যারা শিবিরের নিবন্ধীকৃত সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে খাবারের রেশন লাভ করে। বেশ কয়েকবার শিবির কর্মকর্তারা এ ধরনের অনিবন্ধনকৃত ব্যক্তিদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং পুলিশ 'বিদেশী আইনের' আওতায় তাদেরকে জেলে প্রেরণ করেছে। আলোচ্য বছরে কক্সবাজার এলাকার স্থানীয় কয়েকটি জেলখানায় আনুমানিক ১০৯ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী আটক ছিল। এইএনএইচসিআর কর্মকর্তারা প্রতিমাসে আটক শরণার্থীদের দেখে আসেন।

জুন মাসে সরকারের জোর করে দেশে ফেরত পাঠানো, পুলিশ, আনসার ও মাজিসদের (স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য বিডিজি ক্যাম্প অফিসারদের মনোনিত শরনার্থী কমিউনিটি লিডার) দুর্ব্যাহারের প্রতিবাদে কুতুপালং শরনার্থী শিবিরে কিছু শরনার্থী বিক্ষোভ প্রদর্শন, রেশন প্রত্যাখান ও সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক বয়কট করে। বিক্ষেভকারীরা এইএনএইচসিআর এর কাছ থেকে আরো বেশী সুরক্ষা সুবিধা পাওয়ার লক্ষে তাদের শরনার্থী শিবির কক্সবাজার শহরের কাছাকাছি স্থানান্তরের দাবি জানায়। বিক্ষোভকারীরা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির একজন কর্মকর্তার ওপর হামলা চালায়, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠনো থেকে বিরত রাখে এবং মহিলাদের আত্মনির্ভর কার্যক্রমে যোগদান বন্দ করে দেয়। ইউএনএইচসিআর এর মতে ৬ জুন রাতে একদল বিক্ষোভকারী পুলিশের নিয়মিত টহলের সময় তাদের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ কমপক্ষে ১৫ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। এতে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ইউএনএইচসিআর শরনার্থীদের অস্থায়ীভাবে অবস্থানের অধিকার এবং আত্মনির্ভর কর্মসূচির আওতায় চলাফেরা স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব দিলে সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে তা প্রত্যাখান করে।

শরণার্থীদের মর্যাদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ সনদ এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের আলোকে শরণার্থী বা আশ্রিতের মর্যাদা দেয়ার বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নয়। কার্যত সরকার বলপূর্বক প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু সব সময় শরণার্থীর মর্যাদা বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে নি। "ইউএনএইচসিআর" সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার সাময়িক আশ্রয়ের ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছিল।

অনুচ্ছেদ ৩

রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: সরকার পরিবর্তনের নাগরিক অধিকার

দেশের সংবিধান নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সময়ান্তরে অবাধ ও শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাগরিকরা এই অধিকার প্রয়োগ করে থাকে।

বাংলাদেশ একটি বহুদলীয় ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দেশ যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কমপক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সংসদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রার্থী নিয়োগ করে থাকেন। অনেকেই অভিযোগ করে থাকে যে কিছুসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর পরিমাণে চাঁদা দিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে "উপহার" প্রদান করে পার্টি নেতাদের কাছ থেকে মনোনয়ন "ক্রয়" করে থাকে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী খালেদা জিয়া ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বচিত হন। সাধারণ নির্বাচনটিকে দেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকবৃন্দ সাধারণভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে অভিহিত করেছেন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০১ জাতীয় নির্বাচনে কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটে। বিএনপি জামায়াতে ইসলামী , বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট নিয়ে দল গঠন করে। রাজনৈতিক দৃশ্যপট দু'টি প্রধান দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রন করে।

জুন মাসে আওয়ামী লীগ প্রায় এক বছর বর্জনের পর সংসদে ফিরে আসে এবং সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি স্পীকারের পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে আবার পার্লামেন্ট বর্জন করে। তারা নভেম্বর মাসে পুনরায় পার্লামেন্টে ফিরে আসে।

দুর্নীতি এখনো একটি সমস্যা হয়েই রয়েছে । সেপ্টেম্বরে মাসে প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর এক প্রতিবেদন ইঙ্গিত দেয় যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ। টিআইবির একটি নমুনা জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৯০ ভাগ লোক জমির মালিকানা পরিবর্তন রেজিস্ট্রেশনের সময় কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে থাকে। এসটিএ'র আওতায় দায়ের করা শতকরা ৬৭ ভাগ মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট, আদালতের কর্মকর্তা ও আইনজীবীরা ঘুষ গ্রহন করে; চট্টগ্রাম বন্দরে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাষ্টমস কর্মকর্তারা আমদানী ও রপ্তানীকারকদের কাছ থেকে বছরে ৭৮৩ কোটি টাকা ঘুষ আদায় করে থাকে। অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট অব ১৯২৩ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগনের তথ্য যাচাই থেকে রক্ষা করে, এবং সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা ব্যাহত করে।

নভেম্বর মাসে সরকার তিন সদস্যের দুর্নীতি দমন কমিশনর গঠনের ঘোষণা দেয়। বছর শেষ হলেও এই কমিশন পুরোপুরি কাজ শুরু করেনি।

জনগনের সরকারি তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য কোন আইন নেই। অথচ অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট তথাকথিত জাতীয় নিরাপত্তার নামে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের জনগনের তথ্য যাচাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

৩০০ আসনের জাতীয় সংসদে সাতজন মহিলা সদস্য রয়েছে। ১৭ মে সংসদ মহিলাদের জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের বিধান সম্বলিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাশ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যার ভিত্তিতে এই সংরক্ষিত আসনগুলো বন্টন করা হবে। আওয়ামী লীগ এই বিলের বিতর্কের সময় সংসদে যোগদান না করলেও বাইরে থেকে এই বিল মহিলাদের সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহন নিরুৎসাহিত করবে উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ জানায়।

অক্টোবর মাসে পার্লামেন্ট নতুন এই আসনগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিত আইন পাশ করে। যদিও বছরে শেষেও এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

একই কারণে কয়েকটি নারী অধিকার গ্রুপ এই সংশোধনীর বিরোধীতা করছে এবং এর হাই কোর্টে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীসহ চারজন মহিলা মন্ত্রী পর্যায়ের অবস্থানে রয়েছে। অক্টোবর মাস পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের ৭৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৪ জন মহিলা। সংখ্যালঘুদের জন্য আসন রাখার কোন বিধান নেই। জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ সংখ্যালঘু এবং তারা সংসদীয় আসনের শতকরা তিন ভাগেরও কম আসন লাভ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৪

মানবাধিকার লংঘনের কথিত অভিযোগ তদন্তের কাজে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী সংগঠনগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি

বিভিন্ন ধরনের দেশী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সাধারনভাবে সরকারের বাধা ছাড়া স্বাধীনভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেছে এবং সেগুলো সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেও সংগঠনগুলো নিজেরাই রাজনৈতিকভাবে নাজুক মামলা ও বিষয়সমূহে স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ মেনে চলে। সরকার কয়েকজন মানবাধিকার প্রবক্তা ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপ প্রয়োগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের মতো ঘটনা অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কর্মীদের জন্য 'রিএন্ট্রি' ভিসা প্রদানে দীর্ঘ বিলম্ব। যেসব মিশনারি মানবাধিকারের সপক্ষে কাজ করেন, তারাও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কয়েকজন মানবাধিকার কর্মী জানিয়েছেন যে তারা গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে হয়রানির শিকার হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহি পরিচালক সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে কাজ করায় সরকার সংস্থাটিকে বিদেশী সাহায্য প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

আলোচ্য বছরে সরকার দেশের অভ্যন্তরে এনজিওগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে এনজিও নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে। কিছু এনজিও এবং উন্নয়নসহযোগীদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত সরকার অবশ্য সংসদ থেকে এই খসড়া বিলটি প্রত্যাহার করে নেয়।

১৫ জুন একটি পৃথক কারণে গ্রেফতারের পর ২০ জুন পুলিশ বেসরকারি সংস্থা প্রশিকার সভাপতি

কাজী ফারুক আহমদেসহ তার আরো ছয় সহকর্মীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে এপ্রিল মাসে সরকার পতনের নীল নকসা প্রনয়নের অভিযোগ আনা হয়। পুলিশ বেশ কয়েকদফা প্রশিকা কার্যালয়ে হানা দেয় এবং বেশ কিছু ডকুমেন্ট জব্দ করে। ২৬ জুলাই কাজী ফারুককে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। গত সাধারণ নির্বাচনে প্রশিকা আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ থাকায় সরকার প্রশিকাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত করেছে (অনুচ্ছেদ ১.ঘ দ্রষ্টব্য)।

২১ আগস্ট র‍্যাবের একটি দল ৫৪ ধারায় নন ভায়োলেন্স ইন্টারন্যাল এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সভাপতি রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। পরে তার নাম অস্ত্র আইনে দায়েরকৃত একটি মামলায় তালিকাভুক্ত করা হয়। মাইন বিরোধী প্রচারণায় অংশগ্রহনকারী রফিক ১৯ সেপ্টেম্বর জামিনে মুক্তি পান। তার মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

সরকার জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও আই.সি.আর.সি'র মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাথে সহযোগিতা করে থাকে। আলোচ্য বছরে আই.সি.আর.সি বাংলাদেশ সফরে আসেনি। ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের এশিয়া ও প্রশান্ত মহসাগরীয় অঞ্চলের পরিচালক রোহিঙ্গাদের অবস্থা দেখতে এদেশে আসেন।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং বহু বার জনসমক্ষে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার একটি স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করে নি।

অনুচ্ছেদ ৫

জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শারীরিক অক্ষমতা, ভাষা অথবা সামাজিক মর্যাদার কারণে বৈষম্য

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিককে আইনের সমান সুরক্ষা পাবার অধিকার দিয়েছে। বাস্ত বিকপক্ষে, বৈষম্য নির্মুলের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো সরকার দৃঢ়ভাবে বলবৎ করে নি। নারী, শিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধীরা প্রায়ই সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

নারী

গৃহাভ্যন্তরীণ সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। তবে, অনির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান এবং এধরনের সহিংসতা প্রকাশ্যে প্রচারের ক্ষেত্রে বিরাজিত সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকার ফলে কারণে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা নিরূপণ করা দুরূহ ছিল। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার বেশিরভাগই যৌতুক সংক্রান্ত বিরোধিতার সাথে সম্পর্কিত। মানবাধিকার সংগঠন বিএনডব্লুএলএ দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৫৫ জন মহিলা স্বামীর হাতে নিহত এবং ৩৫ জন নির্যাচিত হয়েছে। অধিকার জানায়, আলোচ্য বছরে ১৬৬ জন মহিলা যৌতুকের কারণে নিহত হয়েছে এবং যৌতুকের কারণে সৃষ্ট বিরোধের ফলে ৭৮ জন মহিলার ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।

আইন অনুযায়ী ধর্ষণ ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর দৈহিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ধর্ষণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। আলোচ্য বছরে ৮৯৬ টি ধর্ষণের ঘটনা জানা গেছে। এসব ঘটনায় ১১৭ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা এবং ১৩ জন ধর্ষিতা আত্মহত্যা করে। বহু ধর্ষণের ঘটনার কোন রিপোর্ট করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার মেয়েরা সামাজিক কলঙ্কসহ ধর্ষণ পরবর্তী মানসিক নির্যাতনের যন্ত্রণা এড়াতে এই ব্যাপারে কোথাও কোন অভিযোগ করেনা।

পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে বৈধ এবং আলোচ্য বছরে এই সমস্যাটি অব্যাহত ছিল। বৈধভাবে পতিতাবৃত্তির বয়স ১৮ বছর হলেও বয়সের ব্যাপারে দেয়া মিথ্যা বিবৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে ভাবে কর্তৃপক্ষ উদাসীন। শিশুদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার দায়ে খুব কমই বিচার হয়ে থাকে এবং পতিতালয়গুলোতে বিপুল পরিমান শিশু রয়েছে। ইউনিসেফের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ১০ হাজার শিশু পতিতা রয়েছে তবে আরেকটি হিসেবে এই সংখ্যা ২৯ হাজার বলে ধারণা করা হয় (অনুচ্ছেদ ৫, শিশু দ্রষ্টব্য)।

আইনের আওতায় মহিলাদের বিরুদ্ধে কয়েক ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত নির্যাতন এবং সহিংসতার অভিযোগ বিচারের উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ নিয়মাবলী রয়েছে। আইনে কঠোর সাজা, নির্যাতিতদের ক্ষতিপুরণ দান, এবং কাজে অমনোযোগিতা অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ না করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে এসব আইনের প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে প্রচলিত আইনের একটি সংশোধনী কার্যকর হয় যার আওতায় যৌতুক সংশ্লিষ্ট অপরাধের সাথে জড়িতদের শাস্তির বিধানগুলো এবং নারীদের "অসম্মানজনক" ঘটনার কারণে আত্মহত্যার কারণ উদঘাটনের বিধানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে।

সরকারী সূত্রগুলোর মতে, দুস্থদের জন্য সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছয়টি ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করে যেগুলোর মোট লোক ধারণ ক্ষমতা দুই হাজার তিনশ'। এছাড়াও, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের ছয়টি বিভাগীয় সদর দপ্তরের প্রতিটিতে একটি করে মোট ছয়টি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করে।

২০০২ সালে সমাজ কল্যাণ দফতর ঢাকায় একটি নিরাপত্তা হেফাজত কেন্দ্র চালু করে। ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ) পরিচালিত দু'টি হেফাজত কেন্দ্র রয়েছে। কিছু সংখ্যক এনজিও দুস্থদের জন্য এবং দুস্থ নারী ও শিশুদের আশ্রয় প্রদান করে থাকে। তবে যারা নির্যাতনের শিকার তাদের জন্য এই সব কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। যার ফলে সরকার ধর্ষণের অভিযোগকারী মহিলাদের "নিরাপত্তা হেফজতে" রাখে যার অধিকাংশই কারাগারগুলোতে অবস্থিত। নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা নির্যাতিতরা অধিকাংশ সময়েই আরও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে যার ফলে অন্যান্য মহিলারা তাদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত সহিংসতা সম্পর্কে অভিযোগ করা থেকে নিরুৎসাহিত বোধ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিকভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের দীর্ঘকাল যাবৎ নিরাপত্তা হেফাজতে রেখে দেয়া হয় এবং এ থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্যে দুরূহ হয়ে ওঠে (অনুচ্ছেদ ১.গ দ্রষ্টব্য)।

সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী ১৮৪ মহিলা নিরাপত্তা হেফাজতে এবং তাদের সঙ্গে ৩২০ টি শিশু রয়েছে।

পল্লী এলাকায় মাঝে মধ্যে বিচার বিভাগ বহির্ভূত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে বিশেষ করে ধর্মীয় নেতা ও ফতোয়ার মাধ্যমে মহিলাদের শাস্তি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সব ঘটনার মধ্যে রয়েছে নৈতিক অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মহিলাদের শাস্তি প্রদান, যেমন বেত্রাঘাত করা (অনুচ্ছেদ ২.গ দ্রষ্টব্য)। এএসকে চলতি বছর দেশ এই ধরনের ৩৫টি ঘটনা তালিকা ভুক্ত করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২৬ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার একটি গ্রামের অভিজাত শ্রেণী একটি অবৈধ সন্তান জন্ম দেয়ায় পাপিয়া খাতুনকে গ্রাম থেকে পাঁচ বছরের জন্য বহিষ্কার করে।

এসিড হামলা ক্রমশঃই একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে উঠেছে। হামলাকারীরা বহু সংখ্যক মহিলার মুখে এসিড ছুঁড়ে মেরেছে এবং এর শিকার পুরুষের সংখ্যাও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসিড নিক্ষেপের শিকারদের মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং বেশির ভাগ সময় দেখা গেছে তারা দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে। অধিকারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ বছর প্রায় ৩০০ টি এসিড আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। অধিকার ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম জানায়, এসব আক্রমণের মধ্যে ১৯১ টি মহিলার উপর, ৬৫ টি পুরুষের উপর এবং ৬৬ টি শিশুর উপর চালানো হচ। এসিড হামলাকারীরা খুব কম ক্ষেত্রেই শাস্তি লাভ করেছে। ২০০২ সালের মার্চ মাসে সরকার এসিডের সহজ লভ্যতা নিয়ন্ত্রণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে এসিড সহিংসতার ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে আইন জারি করেছে। তবে এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং এই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় এর কার্যকারিতা সীমিতই রয়ে গেছে। নতুন এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় অপরাধীকে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে দ্রুততর বিচারের বিধান রয়েছে। এই আইনের আওতায় অভিযুক্তদের সাধারণত জামিন দেয়া হয় না। আলোচ্য বছরে স্পেশাল ট্রাইবুনাল পুরোপুরি কার্যকর ছিলনা। এসিড সার্ভাইবার্স ফাউন্ডেশনের মতে এ বছর এসিড নিক্ষেপের দায়ে ৩৬ জনকে সাজা দেয় হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের স্থান গৌণ। সরকার তাদের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্সের আওতায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ এবং রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে তালাকের বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পল্লী এলাকায় অনেক বিয়েরই কোন রেজিস্ট্রি হয় না আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

বিগত দশকে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের চাকুরীর অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের বিকাশ। পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের আনুমানিক ৮০ শতাংশই মহিলা।

পল্লী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিপুল সংখ্যক মহিলার মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী সম্প্রসারণ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার উনড়বয়ন ঘটিয়েছে। একই ধরনের কাজে সাধারণত মহিলারা পুরুষদের অনুরূপ বেতন পেয়ে থাকে।

২০০৩ সালে চাকুরীদাতাদের নির্যাতনে শিকার হয়ে ৬০ জন গৃহপরিচারিকা নিহত হওয়ার অভিযোগে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নেয়া হয়নি এবং ব্যাবস্থা নেয়া হবে এমন আশাও নেই।
২০০০ সালের গণপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী মহিলারা সরকারী পদের মাত্র শতকরা ১২ ভাগে অধিষ্ঠিত রয়েছে যার শতকরা দুই ভাগ মাত্র উচ্চ পদ। সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক মহিলা নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী নীতির কার্যকারিতা ছিল সীমিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগকৃত মোট জনগোষ্ঠির প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ হচ্ছে মহিলা।

শিশু

সাধারণভাবে সরকার শিশু অধিকার ও কল্যানের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। সরকারী উদ্যোগের সমর্থনে অনেক স্থানীয় ও বিদেশী এনজিও সম্পুরক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই সমস্ত যৌথ উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নয়নে এই দেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তবে, অর্ধেকেরও বেশি শিশু দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির শিকার।

আইন অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুদের স্কুলে যাওয়া এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করা বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। বাবামায়েরা স্কুলে যাওয়ার বদলে তাদের ছেলেমেয়েদের অর্থ উপার্জনের মত কোন কাজে অথবা গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত করায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকার নানাভাবে পরিবারগুলোকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠনোর জন্যে উৎসাহিত করায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ক্যামপেইন ফর পপুলার এডুকেশন-এর ২০০১ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে আশি শতাংশের অধিক বিদ্যালয়ে নাম লিপিবদ্ধ করেছে। এদের মধ্যে বালক ও বালিকাদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। ২০০২ সালে প্রায় ৭০ শতাংশ শিশু পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছে এবং ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রী সংখ্যা শতকরা ২৪ দশমিক ৩ ভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আলোচ্য বছরে স্কুল বয়সী শিশুদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সরকার মেয়েদেরকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও ষষ্ঠ শ্রেনী থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে । ছেলেরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই সুবিধা পেয়ে থাকে।

দেশে শিশুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ কিছু সরকাররি হাসপাতাল রয়েছে এবং সরকারি হাসপালগুলোতে ছেলে ও মেযে উভয়েই সমান সুবিধা পেয়ে থাকে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে আলোচ্য বছর ৩৪১ টি শিশু অপহরণ করা হয়, প্রায় ১,৪০১ টি শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে এবং ৬৬০-এর অধিক শিশু ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, এবং এসিড আক্রমণের মত মারাতড়বক ঘটনার শিকারে পরিণত হয়। শিশু অধিকার কর্মীদের মতে. শিশু অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে আলোচ্য বছরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশু নির্যাতন কিছুটা কমেছে।

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশুই অত্যন্ত কম বয়সে কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়। এর ফলে প্রায়ই শিশুদের ওপর নির্যাতন হয়। বাসাবাড়ির কাজে নিয়োজিত শিশুদের সাথে তাদের চাকুরীদাতারা দুর্ব্যবহার করে। বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে অনেক সময় সেই শিশু কাজের মেয়েদেরকে প্রায় ক্রীতদাসের মতো এবং পতিতার মতও ব্যবহার করা হয়। (অনুচ্ছেদ ৬.গ এবং ৬.ঘ দ্রষ্টব্য)। মাঝে মাঝে কর্মস্থলে শিশুদের মারাত্মকভাবে আহত বা নিহত হবার ঘটনা ঘটে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শিশুদের ত্যাগ করা, অপহরণ এবং শিশু পাচার একটি ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। ব্যাপক হারে শিশু পাচার হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ৫, পাচার দ্রষ্টব্য)।

সরকারী সংবাদ সংস্থা বাসস এর ২০০২ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে দেশে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ছিল চার লাখ। এদের মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু তাদের মা-বাবা সম্পর্কে কিছু জানে না।

যে সকল শিশুর মা-বাবা কারারুদ্ধ তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি অত্যন্ত কম।

মানুষ পাচার

মানুষ পাচার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষ পাচার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে রয়েছে। অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহারের জন্য শিশু পাচারের দায়ে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বিধান রয়েছে এবং সরকার পাচারকারিদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে। আলোচ্য বছরে বিশেষ আদালত নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ৪৩ টি মামলার নিষ্পত্তি করে। এসব মামলায় ৩৩ জনের বিরুদ্ধে মৃতুদন্ড থেকে শুরু করে ১০ বছরের কারাদন্ড পর্যন্ত দেয় হয়। পাশাপাশি পুলিশ, কোস্ট গার্ড, বিডিআর ও র‍্যাব ও বেশ কিছু এসজিও পাচারকালে বেশ কিছু ব্যক্তিকে উদ্ধার ও তাদের সহযোগিতা করে।

সরকারী সুত্রের হিসেব অনুযায়ী আলোচ্য বছরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পাচারকারীদের কবল থেকে ১৪৭ জনকে উদ্ধার করেছে।

সারা বছরে ১৭ বিভিন্ন ধরণের ঘটনায় পাচারকৃতরা পালিয়ে এসে পুলিশকে রিপোর্ট করে। সরকার এই সব ঘটনার শিকার ৮৫ জনকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। ৯ জনকে বিভিন্ন সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে এবং ১৯ জনকে এনজিও পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

আলোচ্য বছর বাংলাদেশ ন্যাশনাল উইমেন লইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন বা 'বিএনডব্লুএলএ' ৩১৪ জন পাচারকৃতকে দেশের ভিতর থেকে উদ্ধার করেছে এবং আরো ৩২ জনকে ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। পাচারের অপরাধে ঠিক কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে খবর জানা কষ্টকর, কেননা, পাচারকারীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধের জন্য -- যেমন যথাযথ ছাড়পত্র ছাড়াই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা, ইত্যাদি।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে সেন্টার ফর উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন স্টাডিজ (সিডব্লিউসিএস)-এর পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে বলা হয়, পাচারকৃত শিশুদের এক শতাংশ এবং অপহৃত শিশুদের ৫৫ শতাংশকে ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০২ সালের জুন মাসের মধ্যে উদ্ধার করা হয়। সিডব্লিউসিএস-এর তথ্য অনুযায়ী পাচারকৃত ছেলেদের অধিকাংশেরই বয়স দশ বছরের নিচে এবং পাচারকৃত মেয়েদের অধিকাংশেরই বয়স ১১ থেকে ১৬-র মধ্যে।

ঠিক কত সংখ্যক নারী ও শিশুকে পাচার করা হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। তবে মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হিসাব করেছেন যে, পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২০ হাজারের বেশি নারী ও শিশুকে দেশ থেকে পাচার করা হয়। সরকার অবশ্য এই তথ্য সমর্থন করে না। ভাল চাকুরি বা বিয়ের লোভ দেখিয়ে অধিকাংশকে পাচার করা হয়। কাউকে কাউকে দেশের বাইরে দাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ না পেয়ে কোন কোন পিতামাতা কখনো কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ছেলেমেয়েদের অন্যত্র পাঠায়। অবিবাহিত মা, এতিম বা স্বাভাবিক পারিবারিক ছত্রছায়ার বাইরে যারা, তাদেরও পাচার হয়ে যাওয়ার বেশি ঝুঁকি থাকে। বিদেশে বসবাসকারী পাচারকারীরা কোন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয় কোন মেয়েকে বিয়ে করে গন্তব্যে গিয়ে বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। নতুন "বন্ধু" বা

"স্বামীর" কাছে বিক্রি করে দেয়া মেয়েটিকে জোর করে লাগানো হয় শ্রম দাসত্বে, দৈহিক কাজে বা পতিতাবৃত্তিতে। অপরাধীদের চক্রগুলোও কিছু মানুষ পাচারের কাজে নিয়োজিত থাকে। ভারতের সংগে সীমান্তে, বিশেষ করে যশোর ও বেনাপোল সীমান্তে, নিয়ন্ত্রণ শিথিল থাকায় সহজেই অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করা যায়।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাসযোগ্য খবর অনুযায়ী পুলিশ ও স্থানীয় সরকার কর্মকর্তারা প্রায়ই নারী ও শিশু পাচার উপেক্ষা করে থাকে। চোখ বুঁজে থাকার জন্য তাদের সহজেই ঘুষ দেয়া যায় (অনুচ্ছেদ ১.গ ও ৫ দ্রষ্টব্য)।

অতীতে এই মর্মে বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট রয়েছে যে পুলিশ শিশু ও নারী পাচারে সহায়তা করেছে; যদিও আলোচ্য বছরে এই সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। অনেক এনজিও এবং সামাজিক সংগঠন প্রতিরোধ প্রচেষ্টা, গবেষণা, উপাত্ত সংগ্রহ, ডকুমেন্টেশন, প্রচার, সচেতনতা সৃষ্টি, নেটওয়ার্কিং, আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা, আইন প্রয়োগ, উদ্ধার, পাচারকৃতদের পুনর্বাসন, এবং আইন সংস্কারের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। পাচার বিরোধী একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক 'অ্যাকশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং অ্যান্ড সেক্স্যুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অব চিলড্রেন' (এটিএসইসি) সম্প্রতি বেশ কয়েকটি পাচার বিরোধী কার্যক্রমের বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এনজিও এবং সরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করা, জাতীয় পাচার বিরোধী এজেন্ডাকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করা, এ বিষয়ে উপাত্ত লেনদেনের উদ্দেশ্যে একটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনগুলোতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা। অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পাচার সমস্যার ওপরে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে এবং কর্মশিবির ও সচেতনতা কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। পাচারের শিকার হওয়ার আগেই এই কর্মসূচী যাতে সম্ভাব্য শিকারদের কাছে পৌঁছে সে কার্যক্রম তাদের রয়েছে। বিগত তিন বছরে এনজিও এবং সরকার সহ অন্যান্য সকলের মধ্যে সহযোগিতার ফলে পাচার সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ এবং ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সরকার পাচার সমস্যার ব্যাপারে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এই সমস্যা মোকাবিলায় কয়েকটি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে একটি কার্যক্রমের সূচনা করেছে। আদম পাচারের দায়ে গ্রেফতার ও বিচার কাজ লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে, জাতীয় পাচার প্রতিরোধ অভিযান শুরু করা হয়েছে যাতে এ সমস্যা সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। তবুও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সীমাবদ্ধতা রয়েই গেছে। পাচার বিরোধী সরকারী প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচার, গবেষণা, লবিং, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। পাচারকৃতদের মধ্যে যারা ফিরে এসেছে, তাদের সরকার সহায়তা দিলেও সরকার পরিচালিত আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অপর্যাপ্ত এবং সেগুলো দুর্বলভাবে পরিচালিত।

মে মাসের শেষের দিকে সরকার পুলিশ সদর দফতরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে দেশে পাচার বিরোধী অভিযানের লক্ষে একটি ইউনিট স্থাপন করেছে। এই সেলটি জুন মাস থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। স্বরাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক কমিটি এই পুলিশ সেলের কার্যক্রম এবং পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলোর বিচারকার্যে অগ্রগতি মনিটর করবে। জুলাই মাসের প্রথমদিকে ডেপুটি এটর্নি জেনারেলকে এইসব মামলার সমন্বয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া সরকার ৬৪টি জেলা সদরের প্রতিটিতেই মনিটরিং ইউনিট গঠন করেছে।

গ্রাম পর্যায়ে জন্ম এবং বিবাহের রেকর্ড না থাকার সমস্যা সত্ত্বেও কিছু পাচার মামলার বিচার হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী নাগরিকবৃন্দ

বাংলাদেশের আইনে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমান আচরণ ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষার বিধান রয়েছে। তবে বাস্তবে প্রতিবন্ধীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। আইনে প্রতিবন্ধীদের শারীরিক অক্ষমতা প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা, পুনর্বাসন ও চাকুরি, যানবাহনে সমান প্রবেশাধিকার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার ওপর মনোনিবেশ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের সার্বিক কল্যাণ পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষে বছরের শেষ নাগাদ একটি এ্যাকশন প্লান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয় সরকারী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এনজিও সদস্যদের নিয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারী যে সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেগুলোও অপর্যাপ্ত। তবে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে গৃহীত বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকার কমপক্ষে চারজন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে সরকারী পদে চাকুরী দিয়েছে।

আদিবাসী নাগরিকবৃন্দ

উপজাতীয় জনগণের নিজেদের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার খুব সামান্যই ক্ষমতা আছে। ১৯৯৭ সালে সাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) শান্তি চুক্তি সেখানকার ২৫ বছরের বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়েছে, যদিও সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সমস্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ অব্যাহতই ছিল। ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উপজাতি ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ভূমি সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করা। বিদ্রোহের সময় যে সব উপজাতীয় নাগরিক সংশ্লিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ায় উপজাতীয় নেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ভূতপূর্ব বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমা প্রধানমন্ত্রীর সাথে ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ২০০২ সালের বিভিন্ন বৈঠকে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আলোচ্য বছরে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ৪১ জন নিহত এবং ১৯৯ আহত হয়। একই সময়ে ১২৭ জনকে অপহরণ, ৩ জন নিঁখোজ ও ১০৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলোচ্য বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের এককালের সশস্ত্র বিদ্রোহী এবং পরবর্তীতে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) কয়েক দফা হরতাল ও সড়ক অবরোধ কর্মসুচি পালন করে। আলোচ্য বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি ও মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে।

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে অধিকাংশ অপহরণের জন্য পিসিজেএসএস ও শান্তি চুক্তির বিরোধীতাকারী সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোরাম (ইউপিডিএফ) পরস্পরকে দায়ী করে থাকে। ৯ ফেব্রুয়ারি একদল সশস্ত্র যুবক নানিয়ার চরের শবেকং এলাকার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ইউপিডিএফ এর সাতজন সদস্যকে অপহরণ করে। রাঙ্গামাটিতে বাঙ্গালী ও উপজাতীয়রাও সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় মানুষও বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে তাদের জমি হারানোর বিষয়টি উলেখ করেছেন। ২০০১ সালের বন বিভাগ মৌলভি বাজারে প্রধানতঃ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী খাসিয়া পল্লীতে একটি ইকো-পার্কের উদ্বোধন করে। যদিও আদিবাসী খাসিয়ারা এখানে পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছিল, কিন্তু সরকার এই জমির ওপর তাদের মালিকানা স্বীকার করছিল না। সরকার এই জমির মালিকানা দাবি করে বলেছিল যে খাসিয়ারা অবৈধভাবে এই জায়গা দখল করে আসছিল। ইকো-পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার আলোচ্য বছরে ধীর গতিতে কাজ করছে। ২০০৩ সালে সরকার মধুপুরের গারো বসতি এলাকায় গারোদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা ছাড়াই মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বাস্ত বায়ন শুরু করে।

অন্যান্য সামাজিক শোষণ ও বঞ্চণা

আইনে যে কোন পুরুষ, নারী বা পশুর সঙ্গে ভিন্ন ধরনের যৌন কর্মের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এই আইনের প্রয়োগ খুবই বিরল। এইচআরডব্লুর মতে সমকামীরা পুলিশ ও স্থানীয় অপরাধীদের দ্বারা ধর্ষণসহ নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়। এইচআরডব্লুর মতে সমকামীরা সমসময় চাঁদাবাজদের হুমকীর স্বিকার হয়। এইচআরডব্লু জানায় এছাড়া যারা এইচআইভি প্রতিরোধ ও এইচআইভি/এইডসের ঝুঁকিপূর্ণ বিস্তারের বিরুদ্ধে কাজ করে তারা নানা ভাবে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়।

অনুচ্ছেদ ৬

শ্রমিকদের অধিকার

ক. সমিতি করার অধিকার

সংবিধানে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির সমিতিতে যোগদান করার এবং সরকারের অনুমতি নিয়ে সমিতি গঠন করার অধিকার রয়েছে। তবে বাস্তবে সরকার এটার প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাশীল নয়। দেশে মোট শ্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ। এর মধ্যে ১৮ লাখ নানা ইউনিয়নের সাথে যুক্ত। এই সব ইউনিয়নের বেশীরভাগ আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। ইনফরমাল সেক্টর বা অপ্রচলিত খাতে কর্মরত শ্রমজীবী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। এই খাতে কর্মরত রয়েছেন দেশের মোট শ্রমশক্তির ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ।

আইন অনুযায়ি কোন কারখানায় ইউনিয়ন নিবন্ধীকরণ করতে হলে তাতে সেখানকার শ্রম শক্তির ৩০ শতাংশের অংশগ্রহণ আবশ্যক করা হয়েছে। তাছাড়া, নিবন্ধীকরণের আগে সম্ভাব্য ইউনিয়নকর্মীদের অনেক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা থেকেও নানা অজুহাতে বিরত রাখা হয়। এই সময়ে মালিকরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা নিলেও তার বিরুদ্ধেও কোন আইনী সুরক্ষা নেই। শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, এই বিধান শ্রমিকদের সংগঠন করার, বিশেষ করে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং বেসরকারী খাতে সংগঠন করার স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে খর্ব করছে। একই কারণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (আইএলও) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধীকরণের জন্য ৩০ শতাংশ শ্রমিকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামুলক করার বিধানটি সংশোধনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। বিভিনড়ব কর্মস্থলে বিভিনড়ব মালিকের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করা হলে তার নিবন্ধীকরণ না করার যে আইনগত বিধান আছে তা সংশোধন করার জন্যও আইএলও সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে। আনুমানিক ৫,৪৫০টি শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারীভাবে নিবন্ধিত ২৫টি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাথে সংশিষ্ট বা অঙ্গীভূত। অনিবন্ধিত আরো কয়েকটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (এনটিইউ) কেন্দ্র রয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর চরিত্র কঠোর ভাবে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠনগুলোতেই এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী। যেমনঃ সরকার পরিচালিত চট্টগ্রাম বন্দরে। ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক চরিত্রের কারণে সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের এগুলোতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দকেও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নস শ্রম আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে যেকোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারেন। তবে আলোচ্য বছর এ ধরনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে নিবন্ধিত ইউনিয়ন বা ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের দেওয়ানি দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান রয়েছে। এই সব বিধানের প্রয়োগ অবশ্য অসম। অতীতে পরিবহন অবরোধের মতো অবৈধ কর্মকান্ডের জন্য পুলিশ ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের বিশেষ ক্ষমতা আইনে বা নিয়মিত ফৌজদারী বিধিতে গ্রেফতার করেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনগুলোর সাথে তালিকাভুক্ত হতে কোন বিধিনিষেধ নেই। ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলো এ ধরনের বিভিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরকে আইএলও'র সভায় যোগ দিতে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। এই ধরনের অনুমতি প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতির কোন খবর আলোচ্য বছর পাওয়া যায়নি।

৭ মে টঙ্গীতে একটি সমাবেশে ভাষণ দেয়ার সময় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও ইন্টারন্যাল কনফারেন্স অব ফ্রি ট্রেড ইউনিযনের নির্বাহী সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের আইন প্রণেতা আহসান উল্লাহ মাষ্টারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

সমিতি করার অধিকার সংক্রান্ত 'আইএলও'-র বিশেষজ্ঞ কমিটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে কতিপয় পরিবর্জন, ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভে এবং ইউনিয়ন কর্মকর্তা পদে নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কতিপয় বাধা নিষেধ, সরকারী কর্মকর্তা সমিতির কর্মকান্ডেও ওপর বাধা-নিষেধ, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় যৌথভাবে সংগঠিত হবার এবং দর কষাকষি করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ এবং হরতাল করার অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ লক্ষ্য করেছে।

খ. সংগঠিত হবার এবং যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে মালিকদের দ্বারা ইউনিয়ন কর্মী ও সংগঠকদের প্রতি বৈষম্য করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কার্যতঃ বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তারা সাধারণত কখনো কখনো স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় যে কোন ধরনের ইউনিয়ন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রার বৈষম্যের অভিযোগ সম্পর্কে রায় দিয়ে থাকেন এবং অনেক মামলায় শ্রম আদালত ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য বরখাস্তকৃত শ্রমিকদের পুনর্বহালের আদেশ দিয়েছেন। যাহোক, মামলা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকার কারণে শ্রম আদালতের কার্যকারিতা সার্বিকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এই সব পুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প কৌশল কার্যকর করা শুরু হয়েছে।

শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষি বৈধ তবে শর্ত থাকে যে রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথ দর কষাকষির এজেন্ট হিসেবে বৈধভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ইউনিয়নই কেবল তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। ওষুধ শিল্প, পাট শিল্প বা বস্ত্র শিল্পের মতো বড় বড় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যৌথ দর কষাকষি ঘটে থাকে। তবে বেকারত্বের উচ্চ হারের কারণে শ্রমিকরা চাকুরীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে যৌথ দর কষাকষিতে যায় না । ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌথ দর কষাকষি সাধারণতঃ হয় না। 'দি ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস' তাদের ভাষায় এই ধরনের দর কষাকষির ক্ষেত্রে আইনগত অন্তরায়ের জন্য সরকারের সমালোচনা করেছে। আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারের সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি নেই। তবে ধর্মঘট হচ্ছে শ্রমিকদের প্রতিবাদের একটি সাধারণ পদক্ষেপ এবং ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে ধর্মঘটকে নিষ্পত্তি হয়নি এমন সব বিরোধ নিরসনের একটি বৈধ পন্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের পথ অবলম্বন করেছে। পেশাগত সমিতির আওতায় সংগঠিত কিছু চাকুরীজীবি অথবা অনিবন্ধিত ইউনিয়ন এ বছর ধর্মঘট করেছে। তাৎক্ষণিক ধর্মঘট অবৈধ, তবে, প্রায়শঃই এটা ঘটে থাকে। পরিবহণ খাতেই এই ধরনের ধর্মঘট হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

২০০৩ সালে নভেম্বর মাসে নারায়নগঞ্জের প্যানটেক্স গার্মেন্ট ফ্যাকটরিতে ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপর পুলিশী হামলা অথবা অক্টোবর মাসে ধর্মঘটি ডিপ্লোমা নার্সদের পুলিশী নির্যাতনের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি। (অনুচ্ছেদ ৬ ক দ্রষ্টব্য)

অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী অধ্যাদেশের আওতায় অত্যাবশ্যকীয় ঘোষিত যে কোন খাতে ৩ মাস ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বছরে সরকার এই ক্ষমতা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে । ২০০২ সাল থেকে মূলত প্রয়োগ শুর হওয়া এই অধ্যাদেশটি আলোচ্য বছরেও সরকার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের ওপর প্রয়োগ করা অব্যাহত রাখে।

২০০৩ সালে সরকার উৎপাদন চলাকালীন পাটকলগুলোতে যৌথ দর কষাকষি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতীতে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা জাতীয় বিমান সংস্থার বৈমানিক, পানি সরবরাহ শ্রমিক এবং শিপিং কর্মচারীদের ওপর প্রয়োগ করে। তিন মাস পর পর এই নিষেধাজ্ঞা সরকার পুনরায় জারি করতে পারে।

কোন ধর্মঘট বা লক আউট শুরুর আগে বা পরে সেটা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে এবং সেই বিরোধ নিয়ে শ্রম আদালতে মামলা করার ক্ষমতাও সরকারের আছে।

শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশে আপোষ, মধ্যস্থতা এবং শ্রম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়েছে। বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে ধর্মঘটে যাবার অধিকার শ্রমিকদের রয়েছে। যদি ৩০ দিন বা তার অধিক সময় ধরে ধর্মঘট চলে তাহলে সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতে পাঠাতে পারে; যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এমনটি ঘটেনি।

দেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) রয়েছে। ১৪ জুলাই সংসদ ইপিজেডগুলোতে সীমিত আকারে সংগঠন করা অধিকার দিয়ে একটি বিল পাশ করে। আলোচ্য বছরে দেশের ৫টি রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে (ইপিজেড) শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এবং কারখানা আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই সব আইনে আওতায় শ্রমিকদেরকে যে সমিতি গড়ার অধিকার, যৌথভাবে দর কষাকষি করে মজুরি, কাজের সময়, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সুবিধাদি নির্ধারণের অধিকার দেয়া হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ইপিজেড-এলাকার শ্রমিকরা সেগুলো থেকে বাদ পড়েছে। ইপিজেড এলাকায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ১২৮,৯১৫।

গ. বলপুর্বক বা বাধ্যতামুলক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা

সংবিধানে শিশুশ্রমসহ বলপূর্বক বা বাধ্যতামুলক শ্রম নিষিদ্ধ, তবে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। বলপূর্বক শ্রমের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য 'ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট' এবং 'শপস অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট'-এ কলকারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা আছে, তবে তা কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় না অংশতঃ সম্পদের স্বল্পতার কারণে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রম দাসত্ব নেই। অবশ্য অনেক শিশুসহ অসংখ্য গৃহ পরিচারক-গৃহপরিচারিকা দাসত্বের পরিবেশে কাজ করে। তাদের অনেকে দৈহিক নিপীড়নের শিকার হয় এবং এ কারণে কখনো কখনো তাদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। গৃহ পরিচারিকাদের ওপর অব্যাহত সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। সরকার অতীতে ভৃত্যদের ওপর নির্যাতনকারী গৃহকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে; তবে অনেক গরীব বাবা-মা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি করেছেন। শিশু ও নারী পাচার একটি সমস্যা হিসেবেই বিরাজ করেছে। (অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬. চ দ্রষ্টব্য)

ঘ. শিশু শ্রম পরিস্থিতি এবং চাকুরীর ন্যূনতম বয়স

ব্যাপক দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিশু খুব অল্প বয়সে কাজ করতে শুরু করে। ২০০৩ সালে প্রকাশিত সরকারের জাতীয় শিশু শ্রমিক জরিপের হিসাব অনুযায়ী পাঁচ থেকে ১৪ বছর বয়সের আনুমানিক ৩২ লাখ শিশু আলোচ্য বছরে শ্রমে নিয়োজিত ছিল। ২০০টি বিভিন্ন ধরনের কাজে শিশুদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে ৪৯টিকে শিশুর দৈহিক ও মানসিক কল্যাণের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো শিশুরা কর্মস্থলে গুরুতরভাবে আহত হয় বা মারা যায়। যেমনঃ ১৭ জানুয়ারি সভারের একটি স্পিনিং মিলে কাজ করার সময় ১৩ বছরের একটি শিশু শ্রমিক কনভেয়ার বেল্টের সঙ্গে জড়িয়ে মারা যায়।

শিশুরা প্রায়শঃই ছোট ও প্রান্তিক কৃষি জমিতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ করে। সাধারণতঃ তাদেরকে কাজ করতে হয় দীর্ঘ সময় ধরে এবং তারা মজুরিও পায় কম। কখনও কখনও তাদের কাজের পরিবেশও থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক শিশুশ্রমিক বিড়ি শিল্পে কাজ করে। এছাড়াও ১৮ বছরের নীচের অনেক শিশু চামড়া কারখানার অথবা ইট ভাঙ্গার মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকে। আনুমানিক ১০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বাগেরহাট জেলার দ্বীপাঞ্চলে বছরের পাঁচ মাস ধরে মৎস্য খামার গুলোতে কাজ করে। কোস্ট গার্ড সদস্যরা সময় সময়ে এসব শিশুদের উদ্ধার করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

শিশুরা নিয়মিতভাবে ঘর-বাড়ির কাজ করে। যে সব গৃহকর্তা ভৃত্যদের ওপর অত্যাচার করেছে অতীতে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিটি শিশুর ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বা ১০ বছর বয়স পর্যন্ত লেখা পড়া করা বাধ্যতামুলক। এই আইন কার্যকরভাবে বলবৎ করার কোন প্রক্রিয়া নেই।

রপ্তানিভিত্তিক পোশাক শিল্পের বাইরে শিশু শ্রম বিষয়ক আইন কার্যত বলবৎ করা হয় না। শিশুশ্রম বিষয়ক বিধান লঙ্ঘনের জন্য যে জরিমানার বিধান রয়েছে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, ৪ ডলার থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত (২২৮ টাকা থেকে ৫৭০ টাকা পর্যন্ত)।

পোশাক খাত থেকে শিশুশ্রম নির্মূল করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও আইএলও যৌথভাবে আলোচ্য বছরে যে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত ৪,০০০ টি কারখানা তারা পরিদর্শন করে । জানুয়ারি মাস থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত এই পরিদর্শনে দেখা যায় ১১ টি সদস্য কারখানায় ২৩ জন শিশু শ্রমিক কর্মরত আছে। শিশু শ্রমিক পাওয়া প্রতিটি কারখানাকে ১০০ মার্কিন ডলার (৫৯০০টাকা) করে জরিমানা করা হয়। 'আইসিএফটিইউ'-এর ভাষ্য অনুযায়ী পোশাক শিল্পে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ হারে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে যেখানে ৪৩ শতাংশ রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কারখানা শিশু শ্রম ব্যবহার করেছে, ২০০১ সালে সেই সংখ্যা ৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সাবেক শিশু শ্রমিকদের ইউনিসেফ-এর উদ্যোগে পরিচালিত স্কুলগুলোতে পড়াশুনার পাশাপাশি তাদের উপার্জনের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে সামান্য বৃত্তিও দেয়া হয়।

সরকারের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিদপ্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কিছু সংখ্যক সহযোগী এনজিও-র সহযোগিতায় সারা দেশের শহরাঞ্চলের বস্তিতে কর্মরত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এরা প্রধানত শ্রমজীবী শিশু। সরকার ১৯৯৪ সাল থেকেই আইএলও-আইপিইসি-এর সদস্য । আইএলও/আইপিইসি-এর কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি নির্দিষ্ট শিল্প কারখানায় নির্মম শিশু শ্রম বিলোপের উদ্দেশ্যে ৬০ লাখ ডলারের একটি প্রকল্প। এই সব হচ্ছে: বিড়ি উৎপাদন, দিয়াশালাই উৎপাদন, চামড়া শিল্প, নির্মাণ শিল্প, এবং গৃহ ভৃত্য। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১৯,৮৭৪ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে; ১৯,৫০৮ জন শিশুকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য স্কুলে পাঠানো হয়েছে; এবং ৭,৬২৩ জন শিশু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পূর্ব পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ৫১টি বিড়ি ও ইট ভাঙ্গার কারখানার মালিক তাদের কর্মস্থলকে "শিশু শ্রমিক মুক্ত" ঘোষণা করেছে।

ঙ. কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ভিত্তিতে কোন ন্যূনতম মজুরি নেই। এর পরিবর্তে কয়েক বছর পর পর গঠিত মজুরি কমিশন শিল্পভেদে দক্ষতা বিচার করে মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ করে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের নিয়োগকর্তারা এই বেতন কাঠামো মানেনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অনেক পোষাক কারখানা আইন সিদ্ধ সর্বনিব মজুরি দেয়নি। ছোট ছোট অনেক পোশাক কারখানায় শ্রমিকরা দেরীতে তাদের মজুরি পেয়েছেন এবং তিন মাসের শিক্ষানবিশী কাল পেরিয়ে যাবার অনেক পরেও অনেক শ্রমিক শিক্ষানবিশী কালের বেতন পেয়েছেন। ২০০১ সালে 'আইসিএফটিইউ' জানায়, শতকরা ২১ দশমিক ৭ ভাগে টেক্সটাইল শ্রমিক সবচেয়ে কম বেতন পেয়েছেন।

রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কর্মরত শ্রমিকরা বাইরের শ্রমিকদের তুলনায় সাধারণত বেশী মজুরি পেয়েছেন। কারখানার এক জন দক্ষ শিল্প শ্রমিকের ঘোষিত মাসিক ন্যূনতম মজুরি হলো ইপিজেড এলাকায় ৬৩ ডলার (৩,৪০০ টাকা) ইপিজেড এলাকার বাইরে ৪৯ ডলার (২,৬৫০ টাকা)। এই মজুরি একজন শ্রমিকের পরিবার নিয়ে শোভনীয় জীবনমান রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়।

আইনে এক দিনের বাধ্যতামূলক ছুটিসহ ৪৮ ঘন্টার কর্ম সপ্তাহ নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বাধিক ১২ ঘন্টার ওভারটাইমসহ ৬০ ঘন্টার সপ্তাহও অনুমোদন করা হয়েছে। এই আইন তেমন কার্যকর করা হয় না।

কারখানা আইনে কর্মস্থলে নামমাত্র স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদন্ড স্থির করা হয়েছে। এই আইন ব্যাপক, কিন্তু নিয়োগকারীরা তা বহুলাংশে উপেক্ষা করেছে। আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য শ্রমিকরা আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে প্রকৃত পক্ষে গুটিকয়েক মামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদর্শকদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে তাদের দ্বারা আইন প্রয়োগ জোরালো নয়। বেকারত্বের উচ্চ হার এবং আইনের অপর্যাপ্ত প্রয়োগের কারণে শ্রমিকরা বিপজ্জনক কাজের পরিবেশ সংশোধনের দাবী করলে বা বিপজ্জনক বলে অনুমিত কাজে অংশগ্রহণের অস্বীকৃতি জানালে তাদের চাকুরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।